মহালয়া তো এসে গেল, আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকী। আগামী মাসের ৪ তারিখে মহা ষষ্ঠী। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল বাঙালিই তো এখন পুজোর দিনগুলি কি ভাবে মহানন্দে কাটানো যাবে, তাই ভাবতে ব্যস্ত। একটা প্রশ্ন বারেবারে মনে দোলা দেয়, যে মাকে আমরা এত ভালবাসি, সারা বছর যে মায়ের আগমনের অপেক্ষায় দিন গুনি, আচ্ছা দশমীর দিন সেই মাকেই আমরা কিভাবে জলে বিসর্জন দিয়ে আসি বলুন তো? আসুন না একটু ভাবি, আজকের এই প্রদূষিত বিশ্বে এই প্রথাকে কি সত্যিই পাল্টানো যায় না?

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

কলম হাতে

প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য, নাহার আলম, পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস, দোলা ভট্টাচার্য, অভিজিত চ্যাটার্জি, প্রণব কুমার বসু এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

বর্ষ ১, সংখ্যা ৪
সেপ্টেম্বর ২০১৯

পূজা বার্ষিকী

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য, পদ্য, নাটকের আসর)

বি.দ্র.:   লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

©Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

দূরের জানালা

(পর্ব ৪)

গত সংখ্যাগুলোতে ‘গুঞ্জন’ পত্রিকার জন্মকথা এবং এর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনেক তথ্য আমরা পাঠকদের জানিয়েছি। সম্প্রতি সেই সময়ে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির কয়েকটি (মুদ্রিত সংকলন) আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাই আজ পাঠকদের কাছে সেই ক্ষুদে পত্রিকাগুলির কিছু আলোকচিত্র পেশ করব। আশা করি স্মৃতির কোঠা থেকে খুঁজে পাওয়া এই পত্রিকাগুলির ‘ফ্রন্ট’ ও ‘ব্যাক কভার’এর ছবি দেখতে পাঠকদের ভালই লাগবে।

পত্রিকাগুলি খুব পুরানো হয়ে যাওয়ায় ‘স্ক্যান’ এর ‘রেসাল্ট’ হয়তো খুব একটা ভালো হয়নি, কিন্তু আশা করি, ‘ট্যাব’এ কিংবা ‘কম্পিউটার’এ প্রচ্ছদ ও ‘ব্যাক কভার’গুলো দেখতে সহৃদয় পাঠকবৃন্দের খুব একটা অসুবিধা হবেনা।

এই পত্রিকাগুলি আমাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য, আমরা শ্রী অমিত সান্যাল এবং শ্রী শুভাশিস সান্যাল মহাশয়ের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বিনীতা

রাজশ্রী দত্ত – সম্পাদিকা

শরণ্যা মুখোপাধ্যায় – সহ-সম্পাদিকা ■

পায়ে পায়ে

আজ ১০ই সেপ্টেম্বর, পাণ্ডুলিপির জন্মদিন। অনেকদিন ধরে মাথায় ঘুরছিল ফেসবুকে বেশ অনেক লেখক-লেখিকাকে নিয়ে একটি বিশ্ব ব্যাপৃত সাহিত্যের গ্রুপ করলে কেমন হয়? শেষ পর্যন্ত 'সাহিত্যধারায় কাব্যডালি' নামে একটি গ্রুপ খুলে ফেললাম। এই গ্রুপের প্রথম সদস্য হলেন প্রশান্তবাবু (নির্বাহী সম্পাদক, পাণ্ডুলিপি/গুঞ্জন)। ওনার পরামর্শে গ্রুপটি ব্যক্তিগত রাখা হল প্রায় এক বছর ধরে। তবে গ্রুপে শুরু করা হল নিয়মিত কাব্যচর্চা। ক্ষুদ্র গ্রুপের ক্ষুদ্র অনুশীলনকে বাস্তবায়িত করা হল 'দুই প্রজন্মের কাব্যডালি' প্রকাশের মাধ্যমে।

এইসময় আমরা আরেক জন সঙ্গীনিকে পাশে পাই, যাঁর সাহিত্যানুরাগী রহস্য-রোমাঞ্চের বার্তাকে সাদরে গ্রহণ করা হয়। তিনি হলেন শরণ্যা মুখোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদিকা (পাণ্ডুলিপি/গুঞ্জন)। এরপর থেকে তিনজনে একসাথে মিলে গ্রুপটিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার পথে এগিয়ে চলছি। পাশে পেয়েছি বহু গুনী ও অভিজ্ঞ লেখক ও লেখিকাদের। তাই 'সাহিত্যধারায় কাব্যডালি' এখন আর শুধু কাব্যডালি নয়, সে হয়ে উঠেছে মহীরুহ। এই গ্রুপের নতুন নাম রাখা হয়েছে 'পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)'। আর এই পাণ্ডুলিপির হাত ধরে পুনরায় ঘুমন্ত 'গুঞ্জন'এর আত্মপ্রকাশ হয়েছে। যার উদ্দেশ্য বিশ্ব সাহিত্য দরবারে ছোট বড় সকল লেখক-লেখিকার সৃষ্টিকে সংরক্ষিত করা। ■

বিনীতা
রাজশ্রী দত্ত – সম্পাদিকা, গুঞ্জন

কলম হাতে

কলম হাতে

পাঠকের দরবার

প্রীতম পাল
ছাত্র, হাওড়া

গুঞ্জনের পর পর তিনটি সংখ্যা হোয়াটাস অ্যাপে পেলাম। পড়ার ফাঁকে গল্প পড়ার এক নতুন আনন্দ খুঁজে পেলাম। পত্রিকাটিকে অনলাইনে এইভাবে ই-ম্যাগাজিন রূপে পাওয়ায়, পড়ার উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। গুঞ্জনের তিনটি সংখ্যাতেই (জুন, জুলাই ও অগাস্ট ২০১৯) বেশ ভিন্ন স্বাদের লেখা আছে।

কবিতাগুলোর মধ্যে কিছু যেমন মজার কবিতা আছে, আবার কিছু আছে বেশ অর্থবোধক। লেখিকা নাহার আলমের 'কথা দিলাম' কবিতাটি মন ছুঁয়ে গিয়েছে।

এছাড়া গুঞ্জনের ইতিবৃত্ত থেকে আমাদের প্রজন্ম পুরানো সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে জানতে পারে, যা খুবই মুল্যবান তথ্য।

ভ্রমণকাহিনী দুটি রোমাঞ্চমূলক ও শিক্ষণীয়। এছাড়া রম্যরচনাটিও রস আস্বাদনের ভরপুর উপকরণে পূর্ণ। গুঞ্জনের প্রতিটি টপিক অভিনবত্বের দাবী রাখে। এই প্রয়াস আমাদেরও লেখার উৎসাহ জাগায়।

একটা কথা যেটা বলতে শুরু করেছিলাম; আমাদের প্রজন্মের পাঠক পাঠিকারা সেলফোন ব্যবহার করতেই বেশি অভ্যস্ত। তাই আমি এবং আমার সতীর্থরা সবাই গুঞ্জনের মোবাইল সংখ্যাগুলোকে খুব এনজয় করেছি। আমরা হয়ত অনেকেই আগামী দিনে গুঞ্জনের মাধ্যমেই আমাদের লেখা প্রকাশ করার কথা ভাবতে শুরু করেছি। গুঞ্জন আরও ছড়িয়ে পড়ুক। ■

পাঠকের দরবার

কঙ্কনা বিশ্বাস
ব্যবসায়ী, কলকাতা

"গুঞ্জন" – প্রথম যখন নামটা শুনলাম ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু গত তিনটে সংখ্যা পড়ার পর বুঝতে পারছি "গুঞ্জন" সত্যিই গুঞ্জরিত হতে শুরু করেছে। ই-ম্যাগাজিন নামটা শুনে ছিলাম। কিন্তু এর সাথে সে ভাবে পরিচিত ছিলাম না। গুঞ্জন ই-ম্যাগাজিন হিসাবে সত্যিই খুব মনগ্রাহী হয়ে উঠেছে। ঠিক যেন বই এর পাতা উল্টে উল্টে পড়ছি। খুবই অভিনব। এর জন্য প্রশান্ত বাবু (পি. কে.) এবং রাজশ্রীকে ধন্যবাদ।

মৌসুমী লাহিড়ীর "যান্ত্রিক জীবন" খুবই প্রাসঙ্গিক এবং আজকের জলছবি। প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.) এর "সনেট ২০১৮" কবিতাটিতে নতুনত্বের ছোঁয়া আছে, ভালো লাগল। মালা মুখার্জীর ভ্রমন কাহিনী বেশ ভালো চলছে। আশা করি আরো অনেক কিছু জানতে পারব। আমরা আজ হাসতে ভুলে গেছি। প্রণব কুমার বসুকে ধন্যবাদ। রাজশ্রী দত্তের বর্ষার ওপর প্রবন্ধটি খুবই রোমান্টিক। শরন্যা মুখোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে নতুনত্বের ছোঁয়া আছে। পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাসের "জ্বালা" বেশ ভালোই লাগল। সরজিৎ মণ্ডলের "বৃষ্টি" লেখাটি খুবই ভালো।

সত্যি কথা বলতে কি প্রতিটি লেখাই সময় উপযোগী এবং মনগ্রাহী। সম্পাদনা গুনে ম্যাগাজিনটি আরো আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে। অনেক প্রতিভাধর লেখক লেখিকা নিজেদের মেলে ধরতে পারছেন "গুঞ্জন" এর পাতায়। ■

একটি ভাবনা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কমিক্সে অতিমানব চরিত্র

শরণ্যা মুখোপাধ্যায়

আধুনিক যুগের শুরু ঠিক কবে থেকে সেটা ঐতিহাসিকরা একটা সময়কাল ধরে বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দর্শনগত দিক দিয়ে একটি বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে ঘণ্টা বাজিয়ে কোন যুগাবসান হয় না। আর "আধুনিক" কথাটার ব্যাপকার্থও ক্ষেত্রবিশেষে প্রণিধানযোগ্য। ইউরোপে প্রাক ও উত্তর-রেনেসাঁ সময়ও আধুনিকই। তবে বর্তমান প্রবন্ধে যে সময়কালের উপর আলোকপাত করা হচ্ছে সেটি হলো ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ।

সালটা ১৮৫৯। প্রকাশিত হলো ডারউইনের যুগান্তকারী গ্রন্থ On the Origin of Species। এই বইটি বিবর্তনবাদের যে তত্ত্ব আনল তা প্রসারিত করল আরেকটি বাঁধভাঙা চিন্তকের প্রকাশ পথঃ ফ্রয়েড, বার হলো, The Interpretation of Dreams. সালটা ১৮৯৯। এই দুটি গ্রন্থকে, আমাদের তথাকথিত আধুনিক সমাজের মাইলফলক বলা যেতে পারেঃ সভ্যতার "হীনত্ব"কে (LESSNESS) এই দুটি বই প্রাথমিক ভাবে যেরকম প্রকাশ করেছে তা অভাবনীয়। প্রথমটি মধ্যযুগীয়

একটি ভাবনা

চার্চ-অধ্যুষিত ধর্মান্ধ-চৈতন্যহীন জনসমষ্টিকে ধাক্কা দেয় দৈববিহীণ এক পার্থিব জৈবতত্ত্বের দ্বারা আর দ্বিতীয়টি বিণির্মাণ করেছে উত্তর-রেনেসাঁ ব্যক্তি-মানুষের একক সত্তার অপরা-জয়ধ্বনিকে। ইদ, ইগো ও সুপার-ইগোয় খণ্ডিত মানুষ ততদিনে হারিয়ে ফেলেছে বেঁচে থাকার নৈতিক-প্রাসঙ্গিক মাপকাঠিগুলি (Metanarratives): শ্রদ্ধা, সততা, প্রেম, বিনয়, বিদ্যা থেকে শুরু করে দিনগত পারস্পরিকতাটুকুও। শিল্পবিপ্লব যে সমাজের জন্ম দেয় তা পুরোটাই ছিল অর্থকর ও অর্থনির্ভর (cash-nexus based)। ফলে অনর্থ হতেও বেশি সময় লাগেনি। নায়কোচিত ব্যক্তিত্বের অভাব সমাজে এবং তার দর্পণ সাহিত্যে, প্রতিফলিত হতে শুরু করল। তিরিশের দশকের মহামন্দার সময় এই বিষয়টি কমিকসের মত জনমুখী লেখনীতে প্রভাব ফেলল।

কমিক্স অর্থাৎ পরপর সংযুক্ত কতকগুলি বাক্যসহ অর্থপূর্ণ চিত্র কিন্তু রোমে ট্রাজানের স্তম্ভেও আছে যা কিনা খ্রীষ্টপূর্ব ১১০ শতকে রচিত হয়েছিল ডেসিয়ান যুদ্ধে সম্রাট ট্রাজানের জয় উদযাপনের সময়। এছাড়াও ঐতিহাসিকরা বেয়ুস ট্যাপেস্ট্রি (Bayeux Tapestry) বা কাপড়ে বোনা ইংল্যাণ্ডে নরম্যান বিজয়গাথাকেও কমিক্সের আদি পিতা বলে মানেন। তবে ছাপা-অক্ষরে কমিক্স কবে শুরু হয়েছিল সেটা নিয়ে ইউরোপীয়, আমেরিকান আর জাপানের সংস্কৃতিতে ভিন্নমত রয়েছে। বলা হয়, ইউরোপীয় রোডোলফ টপার, (আনুমানিক

১৮২৭) আমেরিকান রিচার্ড আউটকল্ট (আনুমানিক ১৮৯০) আর জাপানের হকুসাইয়ের (উনিশ শতক) ঐতিহ্যকে যথাক্রমে অণুসরণ করেছেন পরবর্তী সময়ের দেশীয় শিল্পীরা। মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের শেষ ও কুড়ি শতক প্রায় পুরোটাই কমিক্সের স্বর্ণযুগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝে সভ্যতার ঊষরতম অধ্যায়ে জন্ম হয় ব্রিটিশ "ডেসপারেট ড্যান" (১৯৩৭) চরিত্রটির। স্রষ্টা ডাডলি ওয়াটকিন্স যদিও প্রথমে চরিত্রটিকে একটি আইন-অবমাননাকারী দুর্বৃত্ত হিসাবে এনেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে সেটি ধীরে ধীরে একটি মহানায়কোচিত অতিমানুষ (superhero) সহানুভূতি-কাড়া চরিত্রে রূপান্তরিত হয়, যে কিনা জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ। যে একহাতে একটি গরু তুলে ফেলে, যার মাথার বালিশ কংক্রিট-বোঝাই, যে দাড়ি কামাতে ব্যবহার করে রাংঝাল-নল (blow-torch)! এই ২০১১ সালেই ডেসপারেট ড্যান অতিমানুষ-ভোটে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করে, প্রথম হয়েছিলেন ব্যাটম্যান। বোদ্ধা পাঠক এতক্ষণে ধরে ফেলেছেন আমাদের ভারতবর্ষীয় কোন চরিত্র এই ড্যানের আদলে তৈরী: হ্যাঁ, "বাঁটুল দি গ্রেট"। ষাটের দশকে নারায়ণ দেবনাথের এই অমর সৃষ্টি প্রথম প্রকাশেই জনমানসে আলোড়ন ফেলে। দেবনাথের বন্ধু বিখ্যাত শরীরচর্চাকারী মনোহর আইচও অণুপ্রেরণা ছিলেন এই কমিক্সের।

একটি ভাবনা

কিন্তু প্রথমেই এতটা শক্তিশালী ছিল না বাঁটুল। তুমুল জনপ্রিয়তা পাবার পর বাংলাদেশ তথা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালে শুকতারা-সম্পাদকের অনুরোধে তিনি বাঁটুলকে অপরাজেয় এক চরিত্রে পরিণত করেন – যে একহাতে পৃথিবী তুলতে পারে, বুলেট ঠিকরে যার শরীরে লেগে, যে কংক্রিট দেওয়াল ভেদ করে যেতে পারে, আবার যেকোন অপরাধীর রাতের ঘুমও কেড়ে নিতে পারে।

জটিল সময়গুলিতেই বারবার অতিমানবদের প্রয়োজনীয়তা ধরা পড়েছে। ভয় যদি আদিম প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে একটি হয়, সমর্পণ দ্বিতীয়। বাঁটুল বা ড্যান চরিত্রের তাৎপর্য তাদের শক্তির শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রয়োগে নিহিত। এই নৈতিক-প্রাসঙ্গিক মাপকাঠি বর্তমান উত্তর-পরবর্তী শূণ্যদশকের ছদ্ম-আধুনিক যুগে এ গ্রহটির প্রকৃত উদ্বর্তনহেতু একান্ত প্রয়োজন। ■

প্রকাশ করুন আপনার নিজস্ব ই-বুক

আপনি কি লেখক?

আপনি কি দেশে বিদেশে পাঠকদের কাছে পৌঁছতে চান?

আপনি কি নিজের ই-বুক বানাতে চান?

আপনি কি আপনার ওয়েবসাইটে ফ্লিপ বুক রাখতে চান?

'পাণ্ডুলিপি' এ ব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সেলফোনঃ +৯১ ৯২৮৪০ ৭৬৫৯০

ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

জীবন দেবতা

দোলা ভট্টাচার্য

এখনও ভীষণ ভাবে বেঁচে আছি আমি,
আমার শরীর থেকে একটা একটা করে প্রত্যঙ্গ
নির্মম ভাবে বিচ্ছিন্ন করেছ তোমরা।
তবু এই অতৃপ্ত চোখ দুটোতে আমার
বাঁচার বাসনা প্রবল।
অস্ত্রের ঝনঝনা শুনিয়ে
ঘুম পাড়াতে চেয়েছ বহুবার,
আঘাতে আঘাতে করেছ জর্জরিত।
তবু দেখ, আমার শিরায় উপশিরায়
উষ্ণ শোনিত স্রোত বন্ধ হয়নি এখনও।
কঠিন ভূমিশয্যা থেকে রাতের তারাভরা
আকাশের কাছে চেয়েছি শান্তির বারি।
শান্তি নয়, পেয়েছি মারণ বিষের মতো
একপাত্র তরল উপহাস তোমাদের কাছে।
তবু মৃত্যু স্পর্শ করেনি আমাকে।
আজ এক নতুন শারদীয়া ভোর,
রাতভর বৃষ্টির পর অরুণ আলোর স্পর্শে
খুলে গেল আমার পূবের জানালা,

তৃপ্তি

সাথে পেলাম আমার মুক্তির চিঠি।
অকুণ্ঠ ভালোবাসায় আজ
ভরিয়ে দিলে তোমরা আমাকে,
দুহাত ভর্তি করে দিলে অজস্র ফুল,
সাথে দিলে বেদনার ভার।
ধন্য হলাম আমি, ধন্য জীবন দেবতা॥ ■

ADVERTISE YOUR PRODUCT IN
GUNJAN
FOR ITS WIDEST PUBLICITY
AT THE LOWEST COST

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

(৩)

এই গ্রামটার নাম ভীমকুণ্ডি। মহাভারতের ভীম মা নর্মদার গতি রুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা সফল হয় নি। সেই থেকে এই গ্রামটির নাম ভীমকুণ্ডি। নদীর মধ্যে একটা কুণ্ড দেখলাম। ওই কুণ্ডতেই মাকে বেঁধে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। এই গ্রামের একটি শিক্ষিত ছেলের সাথে আলাপ হল, নাম শম্ভুনাথজী। পরিক্রমাকারী এসেছে শুনে চাল, ডাল, তেল, সব্জী দিয়ে গেলো খিচুড়ী খাবার জন্য। কিন্তু কাকাজী খাবার অবস্থায় নেই, তিনি শুয়ে পড়লেন।

পাঁচ ধারায় ত্যাগি মহারাজের কথা না শুনে চলে এসে যে কি ভুল করেছি তা এখন বুঝতে পারছি। পরিক্রমা কিন্তু পরিভ্রমণ নয় সেটা বার বার মনে হচ্ছে। কাল পর্যন্ত কাকাজীর একটা জোশ ছিল, আজ আর তা নেই। এগিয়ে যাবার নেশা ওনাকে পেয়ে বসেছিল। মা নর্মদা অসুস্থ করে ওনার সেই ভুলটা ভেঙ্গে দিলেন। আজ সারা দিন এখানে প্রায় বসেই কাটলো। ঠিক বসে নয়, মা এর জপ ধ্যান এবং হবন করে দিনটা কাটালাম। কিছু গ্রামবাসীর সঙ্গে নর্মদা প্রসঙ্গে আলোচনাও হল। রাত প্রায় ১০ টা নাগাদ শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঠাণ্ডায় রাত্রে ঘুম আসছে না। দরজা বলে কিছু নেই। তাই ঠাণ্ডা ঢুকছে। যদিও ধুনি জ্বলছিল কিন্তু রাত বাড়ার

সাথে সাথে তার তেজও কমে এসেছে। রাত যত গভীর হচ্ছে অরণ্য ততই জেগে উঠছে। আমি শহরের লোক, তার ভাষা বুঝি না। অরণ্যের গান শোনানোর জন্য রাত জাগা পাখিরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দূরে জন্তু জানোয়ারের ডাক ভেসে আসছে তবে কোন নরখাদক এখানে নেই বলেই শুনেছি। আমরা আছি পাহাড়ের এক উঁচু টিলায়। এই অঞ্চলটি বিখ্যাত মুণ্ডমারণ্য জঙ্গলের অন্তর্গত। নর্মদা পরিক্রমাকালে যে তিনটি দূর্গম জঙ্গল আছে তার মধ্যে এই মুণ্ডমারণ্য একটি। অন্য দুটি হলো শূলপানীর জঙ্গল বা ঝাড়ি এবং ওমকারেশ্বর জঙ্গল বা ঝাড়ি।

স্রোতস্বিনী পতিতপাবনী সাগরগামিনী মা নর্মদা। কুলু কুলু শব্দ শুনে মনে হচ্ছে একটা বাচ্চা মেয়ে নূপুর পায়ে ছুটে চলেছে। কুয়াশায় চার দিক সাদা হয়ে রয়েছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তাই শ্রবনেন্দ্রীয় এখানে প্রবল ভাবে কাজ করছে। খুব ভোরে উঠে পড়েছি। সূর্য দেবকে দর্শনের অপেক্ষায় বসে আছি। প্রায় ৭ টার পর সূর্য দেবকে এবং নর্মদা মাকে প্রণাম করে আবার যাত্রা শুরু করলাম। কাল সারা দিন বসেই ছিলাম, তাই আজ হাঁটার উৎসাহ একটু বেশী। পরিক্রমার সময় একটা জিনিস আমি উপলব্ধি করেছি পরিক্রমাকারীর নজরে মা নর্মদা না থাকলেও পরিক্রমার সঙ্কল্প নেওয়ার সাথে সাথেই মা নর্মদার নজরে পরিক্রমাকারী সন্তান সবসময় থাকে।

নমামি দেবী নর্মদে

আজ ৩/১১/২০১৫। মা নর্মদা ডানদিকে, জঙ্গল এবং পাহাড় অন্য পাশে। রাস্তা বলে কিছু নেই। কখনো হামাগুড়ি দিয়ে কখনো বা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ একটি মোটা শিকড়ে পা লেগে হোঁচট খেয়ে পড়লাম। মনে হলো প্রায় কয়েক হাজার জোনাকি পোকা চোখের সামনে জ্বলে উঠলো। কয়েক সেকেণ্ড পর সম্বিত ফিরে এলো। দেখি কাকাজী আমাকে টেনে ধরে রয়েছেন। একটা গাছের ডালে আমার শরীরটা ঝুলছে। ডালটি ভেঙে গেলে আমার শরীরের আর কোনো অংশই খুঁজে পাওয়া যেত না। কারণ নীচে অনন্ত খাদ। একটু কষ্ট করে ডাল থেকে নেমে এলাম। তাহলে আমি এখনো বেঁচে আছি! আবার চলতে শুরু করেছি। এগিয়ে চলাই জীবন থেমে যাওয়াই মরণ। পায়ে খুব চোট লেগেছে, কিন্তু তাতে কি?... আমি তো আবার নর্মদা পরিক্রমার সুযোগ পেলাম। জয় মা নর্মদা।

নর্মদে হর।

...ক্রমশ ■

ADVERTISEMENT TARIFF CARD FOR GUNJAN

Page	Size	Cost
Inside Front Cover (FC)	4.3" X 6.9"	Rs. 3,000
Inside Any Full Page	4.3" X 6.9"	Rs. 1,500
Inside Half Page	4.3" X 3.5"	Rs. 1,000
Inside Back Cover (BC)	4.3" X 6.9"	Rs. 2,500
Back Cover (BC)	4.3" X 6.9"	Rs. 3,000

*Any bleed size will cost 20% extra.

আঁধারের শৈশব

অভিজিত চ্যাটার্জি

থর চিবিয়ে যারা বড় হয়েছে,
পাতা কুড়িয়েও তারা ভাত যোগাবে।
অন্ধকারের শৈশব
ঘুচে যাবে একদিন
সোনালী রোদ্দুরে
ডানা মেলে যাবে যৌবন।
মোহনা থেকেই পাড়ি দেবে
মাঝ দরিয়ায়।
হে কবি,
মাথার মধ্যে লিখোনা কোন কবিতা,
হৃদয়ে রাখো তোমার ভাষার আবেগী প্রেরণা
ঐ পারে দেখা হবেই বন্ধু
ঝিকিমিকি জোছনায়।। ■

আপনি কি আপনার কোম্পানির উৎপন্ন পণ্যের বা পরিসেবার কথা সবাইকে জানাতে চান?

'গুঞ্জন' আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে...

সেলফোনঃ +৯১ ৯২৮৪০ ৭৬৫৯০

ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

প্রমোশন

অনির্বাণ বিশ্বাস

সন্ধ্যের পার্টিটা খুবই রঙীন ছিলো। লিলির আরো মধুময় মনে হলো কারণ অশোকের প্রমোশন পার্টি এটা। গান-বাজনার সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসে-গ্লাস ঠোকার ঠন্ ঠন্ আওয়াজ, আর? আরও আছে। সুন্দরী ললনাদের উপস্থিতি, একটু ঢলাঢলি – আর তারপরে তিন চার পেগ পেটে ঢেলে মনটাকে একটু অন্যের সাথে নাচিয়ে তুললে ক্ষতি কি? শরীরের সাথে শরীরের আলিঙ্গনে যদি একটু আগুনই না ধরলো তবে, এই লেট নাইট ককটেল পার্টিতে আসা বৃথা। আজকে সবাই লিবারেল। তোমার স্ত্রী বা গার্ল ফ্রেন্ড শুধু আজকের দিনটাতে তোমার সাথে নাই বা রইলো? তাতে যদি মোটা ডিল হয়, কিংবা প্রমোশন হয়... তুমি অনেক – অনেকটা উপরে উঠতে পারো তো তোমারই লাভ। আরে বাথটবে ভালো করে স্নান করে নিলেই হলো। কিংবা রাত্রে গাড়ীতে চুর হয়ে ফেরার সময় দুজনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা যেতেই পারে! আরে ভালো-মন্দের মাপকাঠি থেকে না উঠলে – মানে এই মিডল ক্লাস মেন্ট্যালিটি থেকে না বেরোতে পারলে তুমি জীবনে কিছুই করতে পারবেনা।

মানসিকতা

নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে লিলি এসব তার শ্বশুরবাড়ী এসে শিখেছে। জীবনের প্রথম পার্টিতে তার স্বামী যেদিন জোর করে তার বসের সঙ্গে শুতে বাধ্য করেছিলো, সেদিনের বুকফাটা কান্নার কথা আজ আর তার ভাবলে অবাক লাগে না। কারণ সে আজ আধুনিক হাই সোসাইটির শিক্ষায় সুশিক্ষিতা। সে শিখে নিয়েছে "চামড়ায় চামড়ায় যুদ্ধ – ধুয়ে ফেললে সব শুদ্ধ।" এই ভাবেই সে তার স্বামীকে জীবনের প্রতিটি পদে সাথ দিচ্ছে। ভবিষ্যতেও দেবে। স্বামী তার ইহ জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। সেই তার ঈশ্বর। বিয়ের সময়ে তার মা-বাবাও এ কথাই বলে দিয়েছিলো।

আজ আনন্দে অশোক বড্ড বেশী ড্রিঙ্ক করে ফেলেছে। চোখের সামনে তার সব ঝাপসা লাগছে। সবাই আস্তে আস্তে বিদায় নেবার পর, সে লিলিকে আদর করে জড়িয়ে ধরে তার কোম্পানীর ভাইস চেয়ারপার্সন – সদ্য বিধবা, অপূর্ব সুন্দরী মিসেস শেলীকে বলল – "আজ আমি যে পজিশনে আছি তা একমাত্র আমার ওয়াইফের জন্য। ভেরী কোঅপারেটিং। বেস্ট বউ।"

"লাভ ইউ জানু।" – এই বলে সে লিলিকে কোলে তুলে টেরাসের উপরে জড়িয়ে বসালো।

"পড়ে যাবো - নামাও প্লিজ।" – আদরামি করে বললো লিলি।

"তুমি সবসময়ে আমার উপরে থাকবে। আমি আছি তো ভয় পেও না।"- এই বলে অশোক তার বউয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

মানসিকতা

"আচ্ছা এই দেখো, আমিও উপরে উঠে বসছি।" – এই বলে অশোকও উপরে উঠে বসলো।

তারপর লিলিকে ফিসফিসিয়ে বলল, "ইউ আর নাউ মিসেস ভাইস চেয়ারপার্সন। কেননা মিসেস শেলী মিস্টার গ্রোভারের মৃত্যুর পর এখন চেয়ারপার্সন হবেন।"

হঠাৎ কাছেই দাঁড়ান মিসেস শেলীর দিকে চোখ পড়তে, সে বলল, "আরে আপনি এতো দূরে কেন? কাছে আসুন। লেটস হ্যাভ অ্যা ড্রিঙ্ক।"

মিসেস শেলী হাসতে হাসতে এসে বললেন, "আমি আর আপনার ওয়াইফ খুব ভালো বন্ধু। আপনি জানেননা। দেখুন আজকে সিক্রেটটা বললাম।"

"ও রিয়্যালি! হোয়াট অ্যা প্লিজেন্ট সারপ্রাইজ। তুমি তো বলনি ডারলিং!" – অশোক কিছুটা অবাক হয়েই লিলিকে বললো।

"আসলে দুজনের পারিবারিক বা স্টেটাস-গত অবস্থান কিছুটা আলাদা হলেও মানসিক অবস্থান একইরকম তো?" – মিসেস শেলী অশোকের বেশ ক্লোজ হয়ে বললেন।

অশোকও সুযোগ পেয়ে মিসেস শেলীর আরো কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে বললো – "তাই!"

মিসেস শেলীও অশোকের ঠোঁটের কাছে ওনার ঠোঁটটা নিয়ে গিয়ে বললেন – "আমার হাসবেণ্ডের শ্রাদ্ধের কাজের সময়ে আমরা নিজেদের সব কথা আলোচনা করে নিয়েছি।

আর আমি আপনাকে তখন থেকেই এই প্রমোশনটা দেবো ঠিক করেছিলাম, বুঝেছেন?"

দুজনে দুজনার এতো কাছাকাছি এসে গেলো যে একে অপরের শ্বাসের গভীরতা অনুভব করছিলো। মিসেস শেলীর কথা জড়িয়ে আসছিল। আর অশোক নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাঁর অপার সৌন্দর্য্য উপভোগ করছিল। এক মুহূর্তের জন্য সে তার স্ত্রীর কথা ভুলে গেছিল। মদের নেশায় লাস্যময়ী মিসেস শেলীর আকর্ষণ তার মনের মধ্যে চাপা বাসনাকে তীব্রতর করে তুলছিল।

মিসেস শেলী ফিসফিস করে বললেন – "আর তখনই, আর তখনই..." – তাঁর গলা আবেশে বুজে আসছিলো। অশোক তাঁর দিকে তাকিয়ে বললো – "আর কি, আর কি বলুন, বলুন..."

হঠাৎই সর্বশক্তি দিয়ে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় মিসেস শেলী অশোককে ওপর থেকে ফেলে দিলেন। আর চরম ঘৃণা ভরে হেসে বললেন – "আর আমরা তোমার জন্য এই শাস্তিই ঠিক করি।"

অশোক আচমকা ধাক্কায় নীচে পড়তে পড়তে তার স্ত্রীর বুকচেরা অট্টহাসির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলো। যেন অনেক দিনের চাপা কান্না সেদিন মুক্তি পেলো। ■

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

খবর সমাচার

নাহার আলম (বাংলাদেশ)

কাশেদের ঝরা শেষে বসন্ত আসে, মঞ্চে খবর ভাসে
তনু, সাগর-রুনী, মিতুরা খুন হয়। মানববন্ধন করে – প্যানায় খবর ভাসে
শহরের এঁদো গলিতে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে টোকাই কুকুরে থাকে মিলেমিশে।
ইউনিসেফ নয়, বস্তি নিধনে বুলডোজার আসে –
খবর ভাসে
খেটে খাওয়া মজুর আলাভোলা জাহালম কোটি টাকার
মামলা খায়। ধূর্ত প্রতারক বিদেশ পাড়ি জমায়।
ভিটেছাড়া হয়ে অবশেষে জাহালম ছাড়া পায়,
খবরের কাগজে আসে।
কারখানার আগুনে অন্তঃসত্ত্বা প্রেমিকার সাথে প্রেমিকও
ঝলসে যায় – স্বেচ্ছায়, ভালোবাসায় –
খবর ভাসে
লাল পাড়ার কাচের – চুড়ি আর বড় টিপের বিলাসী ময়নার
ঘরে খদ্দের আমলারা আসে – খবর ভাসে
নগরের ভাগাড়ে নবজাতক কাঁদে হাসে।

চালচিত্র

বাঁচাতে জলকন্যা বেদেনী রাঙা মাসি এগিয়ে আসে –
খবর ভাসে
একদেশ ডিঙিয়ে আরেক দেশে বোমা ফাটে।
ময়দান ভরে লাশে – খবর ভাসে
আমলার বিনিয়োগে শেয়ারের সূচক বাড়ে
কামলারা শুকনো আঙুল চোষে
– খবর ভাসে...

তেলের সাথে চালের মূল্য বাড়ে
সোনার সাথে নুনের দাম চড়ে
ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভোট বেশি পড়ে
ইলেকশানে নয়, সিলেকশানে দেশ গড়ে
সেলিব্রিটির 'জীবন কথা' বইয়ের কাটতি বাড়ে
বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি ধরা পড়ে
ইউরোপের বেক্সিট ঘটনায় ওয়েবের টনক নড়ে
তালেবান জঙ্গি ওমর নতুন ঘাঁটি গাড়ে
চাঁদ মঙ্গলে জমি কেনার হিড়িক পড়ে
"দেশ মেলা-২০১৯" এর চমক নজর কাড়ে
ক্রিকেটার মোশারফের মাথায় টিউমার ধরা পড়ে
ফেসবুক-টিজারদের দৌরাত্ম্য বাড়ে
সকল জাতীয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য শূন্য,
পাশের হার শতভাগ -- শিক্ষা ব্যবস্থা বাহবা কাড়ে...
খবরের কাগজে এসবও আসে।

চালচিত্র

খবর আসে, খবর ভাসে।
সবকিছুরই খবর ভেসে আসে দেদারসে...
খবরের কাগজে কিংবা দূরাভাষে –
খবর আসে না কেবল,
শান্তির মা যে মারা গ্যাছে, গ্যেলো ফাগুন মাসে,
বিনা চিকিৎসায় নিদারুণ ক্ষয়কাশে... ■

মন

জীবন সংগ্রাম

সুমন কুমার সাহু

মেঘলা আকাশ ছেয়ে
ঝির ঝির সারাদিন
নদীর জলে বেলা যায় বয়ে
যাত্রা অন্তহীন।

ঢেউ ওঠে মনে
ঢেউ ভাঙে হীয়া ডোরে
একলা নাওয়ের কোনে
বয়ে যায় স্রোত মন সাগরে
অচল হালটি ধরে
সময় ফেরি পারাপারে।

প্রেমের গগন মেঘ ভাঙ্গা অংশুর দহনে
মন মাঝি ক্যানভাস জীবনের সংগ্রামে।। ■

ভবিতব্য

প্রণব কুমার বসু

ছিল এক সাদামাটা খিটখিটে বুড়ো
রোজ খেত সকালেই বিস্কুট গুঁড়ো –

নামডাক হলো তার ছবি বেরোতেই
নাক দেখে বলে ঠিক সবকিছুতেই –

কারো নাক খ্যাঁদা-বোঁচা – নাক কারো উঁচু
রাখ-ঢাক নেই কোনো বলে সবকিছু –

পড়াশোনা করেনা যে কোন্ ছেলে মেয়ে
পড়ে যায় ঢলে কবে – কে যে কার গায়ে –

বিয়ে করে হবে ঠিক কার কত ক্ষতি
বুঝে যায় নাক দেখে সব মতিগতি –

রোজ রোজ ভিড় করে আসে কত লোকে
পরপর লাইন দিয়ে তার ঘরে ঢোকে –

মৃত্যুর পরে বলে বড়ি রেখে চাতালে
স্বর্গেতে কারা যাবে – কে যাবে পাতালে।। ■

গুঞ্জন গড়ুন ৯ গুঞ্জন গড়ান

যৌতুক

দীপঙ্কর সরকার (বাংলাদেশ)

কয়েকদিন ধরে মায়ের সাথে কথা কাটাকাটি চলছে। যৌতুক না নিয়ে বিয়ে করাতে মায়ের মনটা ভার হয়ে আছে। অতগুলো নগদ টাকার লোভ কে সামলাতে পারে? রাতারাতি বাড়ি হতো; গাড়ি হতো আরোও কত কি! বরং যৌতুক না নেওয়াতে না বাড়ি হয়েছে; না গাড়ি হয়েছে। বিয়ের আগে মা বারবার উদাহরণ টেনে দিতেন – পাশের বাড়ির রঞ্জনকে দেখ; না জানে লেখাপড়া, তবুও আট লাখ টাকা যৌতুক নিয়েছে। আর কি আমার গনেশ পন্ডিত ছেলে রে; হাড়ি চলে না তার আবার ভারী ভারী গপ্পো।

তবুও অনড় ছিলাম ; যৌতুক নেব না।

যৌতুক না নেওয়া যেন গ্রামীণ সমাজে এখনো অস্বাভাবিকতা। যৌতুক নেওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি কেন যৌতুক নিই নি সেটা এখন গ্রামের হট নিউজ। প্রতিবেশীদের কানাকানি এখনো বন্ধ হয় নি।

"যোগ্যতা থাকলে তো কেউ যৌতুক দিবে? মেয়ে কি গাঙের জলে ভেসে আসছে? পড়াশুনোটা শেষ করেছে থার্ড ডিভিশন পেয়ে তার আবার যৌতুক? এরকম হাজারটা প্রশ্ন

আমার কানে আসে। মায়ের মন খারাপের পেছনে আরেকটা কারনও আছে। এখানে ছেলে ভালো কি না তার মাপকাঠি যৌতুক; ফলে আমি যে অযোগ্য সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শ্বশুরের অবস্থা খুব একটা স্বচ্ছল না। আমার মায়ের ইচ্ছে সম্পদশালী বাবার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দিবেন যাতে শ্বশুর গত হলে সবটাই আমার হয়। কিন্তু আমি ঠিক বিপরীত কাজটাই করলাম। ফলে, মায়ের সাথে একটা বিপরীত মানসিকতার তৈরি হলো।

বিয়ের দুদিন পরেই দেখি বৌ মন খারাপ করে বসে আছে। বৌয়ের অমন নমনীয় মুখ আমি কখনো দেখিনি। সব সময় হাসিখুশি থাকতো, সবাইকে আপন করে নেওয়ার এক অসামান্য গুন ছিল ওর। হয়তো ভাবতো, শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে খুব সুখে থাকবে।

– মন খারাপ কেন? মা কিছু বলেছেন?

– না

– তবে কেন?

– এমনি

– তবে কি আমার ভুলে?

– না।

জানি তুমি বলবে না। তুমি সর্বংসহা হয়েই থাকবে তবুও মুখ খুলে বলবে না। মন খারাপ করো না। মায়েরও তো বয়স হয়েছে। এমনিতেই মায়ের অবাধ্য হয়েছি।

জাগরণ

সেদিনের পর থেকে আর কখনো বউয়ের মন খারাপ দেখিনি।

ততদিনে রঞ্জনের বাড়ি থেকে রোজই ঝগড়াঝাঁটির শব্দ ভেসে আসে। যৌতুক নিয়ে এসেছি তাই কোন কাজ করতে পারবো না বলে রঞ্জনের বউ শাসায়। বিয়ের দুদিন পর থেকেই পৃথক হওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। ফলে, ওদের বাড়িতে অশান্তি লেগেই আছে।

হঠাৎ মায়ের জ্বর। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। তখন বৌয়ের মাতৃরুপ দেখেছি। সারাক্ষণ মায়ের পাশে বসে সেবা করে, ওষুধ খাইয়ে দেয়, মাথায় জল ঢেলে দেয়। মা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন। সেই থেকে মায়ের আর কোন আক্ষেপ নেই।

শুনলাম আজ রঞ্জনের শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসেছে। বাবা - ছেলেকে পৃথক করে দিবে। গ্রামের দশ, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মিলে সব ভাগাভাগি করে দিচ্ছে। এর চেয়ে কষ্টদায়ক আর কি হতে পারে! রঞ্জনের মায়ের বুকের অর্ধেক অংশ কে যেন ছিড়ে নিচ্ছে। রঞ্জনের মা কেঁদেই চলছে...

আমার বউ গ্রামে একটা স্কুল খুলেছে। গ্রামের নিরক্ষরতা দূরীকরণে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সেখানে বাবা মাও অক্ষর চেনা ও লিখতে পড়তে শিখছে। একদিন মাকে বললাম, ম্যাডামের ক্লাস কেমন লাগছে?

মা মুচকি হেসে বললেন, অনেক ভাগ্য করে এরকম একটা বউ পেয়েছিস। ■

খুড়ো কাহিনী

সুমন্ত ভট্টাচার্য

গোপালপুরের শান্ত মানুষ,
টোপাল খুড়ো পদ্য লেখেন রোজ।
এক হাড়ি ভাত দুধে ফেলে
সারেন রাতের ভোজ।।

পাড়ার লোকে প্রণাম কোরে,
শুধায় তাঁর রোজনামচার খোঁজ।
কেউ জানেনা রাতে খুড়ি
পেটান তাঁকে রোজ।। ■

গুঞ্জনের পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি

জুন ২০১৯ – http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

জুলাই ২০১৯ – http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

অগাস্ট ২০১৯ – http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

ছায়া-কায়া

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(৬)

সুধীরবাবু একদিকে ভাগ্নির কষ্টটা কোথায় তা ভালই বুঝতে পারছেন, আবার অন্যদিকে জয়ের এই অস্বাভাবিক আচরণ তাঁকে গভীরভাবে চিন্তান্বিত করে তুলেছে। কি বলে রঞ্জনাকে সান্ত্বনা দেবেন, আর কিভাবে, কোথায়ই বা জয়কে খুঁজবেন! কিছুই বুঝতে পারছেন না। মাথায় শুধু একটা কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে, জয় কি তাহলে কোনভাবে রঞ্জনাকে ঠকাচ্ছে? নাকি অন্য কোন রহস্য আছে এই সব কিছুর মধ্যে? জয় কি করে হাঁটতে পারে, যেখানে ডাক্তারই সমস্ত আশা ছেড়ে দিতে বলেছে! ঘটনাটার মূলে পোঁছতে হবে; এইসব ভেবে সুধীরবাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না। রঞ্জনাকে না বলেই জয়ের বাড়ি চলে গেলেন।

ভোলা মাথায় হাত দিয়ে বাড়ির রোয়াকের সামনে বসে আছে। সুধীরবাবু যেতেই ভোলা বলল – জয়দাদাকে কে নিয়ে গেল বলুন তো মামাবাবু? বউদিমণি কোথায়? আমরা কি একবার পুলিশের কাছে যাবো?

সুধীরবাবু বললেন – রঞ্জনার শরীরটা ভালো নেই। তাই ওকে আর কিছু বলিনি, আমি নিজেই এলাম। আজকের

রাতটা দেখি, কাল না হয় থানায় যাবো। তুমি আশেপাশে সব জায়গায় খোঁজ নিয়েছো ভালো করে? কেউ কি এসেছিল?

— না কেউ তো আসে নি। দরজা তো বন্ধ ছিল। সেই জন্যই তো ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগছে। আর আশেপাশে কোথাও নেই। আমি রাস্তার মোড় পর্যন্ত ঘুরে দেখে এসেছি।

— আচ্ছা তুমি কখন বুঝলে যে জয় ঘরে নেই?

— হঠাৎ রাতে ঘুম ভাঙতে দেখি সদর দরজা খোলা। আমি প্রথমে ভেবেছি হয়তো আমি ভুলে গিয়েছি দরজা বন্ধ করতে। তারপর আমি দরজা বন্ধ করে, জয়দাদা ঘুমিয়েছে কিনা দেখতে গিয়ে দেখি, দরজা সম্পূর্ণ খোলা, জয়দাদা ঘরে নেই। সব ঘর খুঁজে দেখলাম, কিন্তু কোথাও নেই। তখনই আপনাকে ফোন করি।

এরপর দুজনে ঘরে বসে ভোরের অপেক্ষায় রইলেন, কারণ অর্ধেক রাত তো কেটেই গিয়েছে আর বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে আবার। আস্তে আস্তে রাতের সিক্ত পথঘাট ভোরের প্রথম আলোয় শুষ্ক ও তরতাজা হয়ে ওঠে। শহরে ভোরের প্রাকৃতিক অ্যালার্ম অর্থাৎ কাকের একটানা কর্কশ সুরে সুধীরবাবুর ঘুম বেশ তাড়াতাড়ি ভেঙে গেল। বাকি রাতটা তাঁদের দুজনের জেগে থাকার কথা ছিল, কিন্তু সামান্য ঝিমুনি কখন যে ঘুমের রূপ নিয়েছিল, সে খেয়াল নেই তাঁদের। ভোলার ঘুম এখনো তার

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

সঙ্গ ত্যাগ করেনি, তাই সে এখনও নিদ্রারত। যাই হোক, সুধীরবাবু উঠে যা দেখলেন, তা রঞ্জনার বলা কথাগুলোর সাথে হুবহু মিলে গেল। জয় ঘরে নিজের বিছানায় নিশ্চিন্তের ঘুম ঘুমাচ্ছে। এদিকে সুধীরবাবু বাড়িতে নেই দেখে রঞ্জনা ফোন করে তাঁকে।

— হ্যালো মামা তুমি কোথায়? সকালে উঠে দেখি তুমি ঘরে নেই। তুমি কি জয়ের কাছে গিয়েছো?

— না তো। আমি একটা অন্য কাজে একটু বেরিয়েছি। এসে বলছি মা। এখন রাখি।

ফোনটা রেখে মুখে-চোখে একটু জল দিয়ে সোজা জয়ের ঘরে যান সুধীরবাবু। জয়কে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন তিনি। তারপর বেশ রাগের সাথে বলেন — কে তোমাকে কাল রাতে নিয়ে গিয়েছিল? আর কোথায় নিয়ে গিয়েছিল? আমার মেয়েটাকেই বা বাড়ি থেকে তাড়ালে কেন?

জয় কিছুটা বিস্ময়ের সাথে বিরক্ত হয়ে বলল — আমি কাউকে তাড়াই নি। ওকে আমি নিজের মতো থাকতে বলেছিলাম, যেটা ও করেনি। আর আপনার ভাগ্নির সাথে সাথে মনে হয় আপনার মাথাটাও খারাপ হয়ে গিয়েছে। পঙ্গু মানুষ কোথায় যাবে? আমি রাতে ঘরেই ছিলাম।

— কি, আমার মাথা খারাপ? রাতে যে তুমি ঘরে ছিলেনা সেটা তো ভোলাও ভালো মতো জানে। ডাকি ভোলাকে? সব পরিস্কার হয়ে যাবে।

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

— ভোলাদা তো এখন বউদিমনির তালে তাল মেলায়। ও বলবে সত্যি! আপনি বাড়ি যান তো মশাই। আপনাদের কারোর সাথে কথা বলতে ভালো লাগছে না।

— রঞ্জনা ঠিকই বলেছে, তুমি আর সেই জয় নেই। ঠিক আছে আমি আসছি। বাকি কথা এবার কোর্টে হবে। এই বলে সুধীরবাবু রাগে গটমট করে বেড়িয়ে গেলেন জয়ের বাড়ি থেকে।

কিন্তু বাড়ি থেকে বেরনোর সময় ভোলাকে বলে গেলেন জয়কে যেন চোখে চোখে রাখে, আর কালকের কথা নিয়ে যেন অযথা জল ঘোলা না করে। ...ক্রমশ ■

লেখকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

১) 'গুঞ্জন' এর জন্য আপনার লেখা (MS Words এবং PDF) আমাদের ই-মেল এ পাঠান। সাথে ফটো থাকা চাই।

আমাদের E-mail: contactpandulipi@gmail.com

২) বানান ও যতি চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ প্রত্যাশিত।

৩) পাণ্ডুলিপি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখা 'গুঞ্জন' এর জন্য পাঠাবেন না।

৪) দয়া করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটা শেয়ার করুন।

ভ্রমণ কাহিনী

ডেসার্ট ট্রায়াঙ্গল

(জয়শলমীর পর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়)

মালা মুখার্জী

সোমবারেই সন্ধ্যেবেলা স্যাম স্যাণ্ড ডিউন্সে সূর্য্যাস্ত দেখা ঠিক হল। ক্যামেল রাইডিং ফ্রি। আমরা আর দুপুরে রেস্ট না করে চেঞ্জ করে নিলাম, মা ও লেঙ্গিস আর কুর্তা পরলেন, নইলে উটে চড়া অসম্ভব। উটে চড়তে গেলে আমাদের দশাও লালমোহনবাবুর মতো হবে কিনা তা ভেবে ভয় করছিল।

যাই হোক, প্রথমে একটি জৈনমন্দির দর্শনের পর গেলাম অভিশপ্ত কুলধারা গ্রামে। যেখানে শতাব্দি পূর্বে কোন মরুবালিকার প্রেমে পড়েছিলেন রাজার দেওয়ান সেলিম সিং। কিন্তু জাতি-ধর্মের মিল না হওয়ায় বিবাহ একাধারে অসম্ভব ছিল, অন্যদিকে সে কথা বলারও ক্ষমতা ছিল না। রাজরোষ থেকে বাঁচতে পালিওয়াল ব্রাহ্মণরা রাতারাতি কুলধারা ত্যাগ করে চলে যান কোন অজানার উদ্দেশ্যে। সেই হতে এই অভিশপ্ত স্থানে গড়ে ওঠেনি জনবসতি, গড়ে ওঠেনি অন্য কোনো ইতিহাসও।

কুলধারা দেখার পর অবশেষে পৌঁছলাম স্যাম স্যাণ্ড ডিউন্সে। প্রথমটা উটে চড়তে ভয় করলেও পরে ভয়টা

ভেঙ্গে গেল। ঠিক করলাম বিকানিরেও চড়বো। অবশ্য উটের গাড়ীও আছে, যাতে চড়া বেশ সহজ।

স্যাম স্যাণ্ড ডিউন্সে নামিয়ে দিয়ে উট ওয়ালা তো চলে গেল। তখনও সূর্য্যাস্তের দেরী দেখে বসে রইলাম। না, খালি বসার উপায় নেই, চিপস্, কোল্ড ড্রিঙ্কস নিশ্চয় আসবে। আর এল বাজনদাররা। এক ভদ্রলোক আলগোজা বাজিয়ে শোনাতে চাইলেন, না করলাম না। মরুভূমির এসব বাজনা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, ট্যুরিজিমই এদের ভরসা।

"এই বাজনায় এক সাথে দুটো বাঁশি বাজাতে হয়," বাজনাওয়ালা সাগরমল বললেন, "বড়টা পুরুষ আর ছোটটা মেয়ে বাঁশি। সংসার যেমন দুজন ছাড়া চলে না, তেমনি এ বাজনাও দুজন ছাড়া অচল।" বাজনার সাথে দার্শনিক জ্ঞান ফ্রি। এরপর এলো মুর্চাঙ, মাউথ অরগ্যানের মতো বাদ্যযন্ত্র।

অবশেষে সাড়ে ছটা, সাতটা নাগাদ এলো সূর্য্যাস্তের সময় । আকাশের পশ্চিম কোন লাল, গেরুয়া রঙ ধারন করছে, আর স্যাণ্ড ডিউন্সের মাথায় বাড়ছে লোকের ভীড়। কেউ কেউ উট সমেতই মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ছে। যাই হোক, সানসেট শেষ হলে আবার উটওয়ালা মরুভূমির ওপারে পৌঁছে দিল। আমাদের হোটেলের জন্য নির্দিষ্ট টেন্টে তখন হয়েছে চা-জলখাবারের এলাহি আয়োজন, সঙ্গে মরুভূমির নৃত্যগীত। ওখানেই চাইলে ডিনারও করা যায়। তবে আমরা নাচগান দেখেই হোটেলে ফিরে এলাম। বেশ

ক্লান্ত লাগছিল, সেই সঙ্গে উত্তেজনা কাল আবার সোনার কেল্লা অভিযান।

চিত্র পরিচয়ঃ মরুভূমির বালিয়াড়ীতে স্যাণ্ডরিপলস ও কাঁটাঝোপ...

মঙ্গলবার ঊনিশে ডিসেম্বর ভোরবেলায় মরু বেড়ালের ফ্যাঁচফ্যাঁচানিতে ঘুম ভাঙ্গলেও সারা গায়ে বেশ ব্যথা অনুভব করলাম। উটে চড়ার ফল বোধহয়! বেশ কাঁপুনি দেওয়া শীতও আছে, দিল্লীরই মতো। গিজার চালিয়ে স্নান সেরে তৈরি হয়ে গেলাম। হোটেলের কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট খেয়ে

বেরিয়ে পড়া সোনার কেল্লার উদ্দেশ্যে। হোটেল থেকে বেরতেই দেখি সামনের এম্পোরিয়মটা খুলছে, যেখানে থরে থরে সাজানো সোনার পাথরবাটি। এ সেই ক্লু যা দেখে মুকুলের সোনার কেল্লা কোথায় তা ফেলুদা খুঁজে বার করেন। তবে এসব এখন জয়শলমীরের বাইরে কোথাও পাওয়া যায় না।

আমায় হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে দোকানি ছুটে এল। দুরকমের সোনার পাথরবাটি আছে, একটা সোনালী, অন্যটা ফসিল পাথরের। এতে নাকি দুধ রাখলেই দই হয়, দম্বল ছাড়াই। জল খেলে হয় সকল রোগের নিরাময়। এর মধ্যে প্রথমটা বাজে কথা, দ্বিতীয়টা জানিনা। এসব না বললেও কিনতাম, ফেলুদার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে।

এরপর গাড়ী ছুটল, পুরনো জয়শলমীরের দিকে অর্থাৎ সোনার কেল্লায়, যা এখন ভারতের একমাত্র জনবসতিপূর্ণ কেল্লা। গাড়ী কিছুদূর এগোতেই পাহাড়ের ওপর অবস্থিত সুবিশাল সোনালী বেলেপাথরের প্রাচীর এবং দুর্গের টাওয়ার দেখা গেল, যা সূর্যের আলোয় স্বর্ণ কিরীটের ন্যায় ঝকমক করছে। এই কেল্লার পাদদেশেই রয়েছে শয়ে শয়ে গাড়ী আর ভলভো। এখানেই গাড়ী পার্ক করিয়ে যেতে হবে ভিতরে, হাঁটাও যায়, অটোও নেওয়া যায়। গাইডের ভাড়া আলাদা। আমি অটোওলাকেই গাইড হতে অনুরোধ করি, সে রাজিও হল।

ভ্রমণ কাহিনী

দুর্গের বিশাল লোহার দরজা আর তোরণ দ্বার দিয়ে অটো গেল ভিতরে। রাস্তার দুপাশে বাজার দোকান, বিক্রি হচ্ছে গহনা, চাদর, সোনার পাথরবাটি আর অবশ্যই সত্যজিত রায় এবং ফেলুদা টীমের পটচিত্র। এখানে সত্যজিত রায় ভগবান, তাঁর নামেই প্রতিবছর এত পর্যটক আসে। বিদেশী আর বাঙালী পর্যটকই বেশী, তাই সবাই বেশ বাঙলা বোঝে। স্থানে স্থানে বাংলায় লেখা খাবারের দোকানের বিজ্ঞাপনও আছে, মাছ ভাত আর আলু পোস্তর আশ্বাসন দিয়ে। রাজস্থান মূলত ভেজিটেরিয়ান স্টেট হলেও জয়শলমীর খুব উদার, পর্যটনের জন্যই বোধহয়। এখানকার স্পেশাল খাবার লালমাস (মাটন) অবশ্যই খাওয়া উচিৎ।

...ক্রমশ ■

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট ফরম্যাট ই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও থাকা চাই। ছবির সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: অক্টোবার সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ২০ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

দুঃস্বপ্নের রাতে আমরা কজন

স্বাগতা পাঠক

সেবার আমাদের ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যানটা হঠাৎ করেই হলো। প্রথম প্রস্তাবটা রেখেছিল অনুরাধা, একটানা পড়াশুনার চাপে ছিলাম, সকলেরই তাই এবার একটু রিফ্রেশমেন্ট দরকার। আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের ফাইনাল সেমিস্টার শেষ, সময়টা ছিল জুলাই মাসের শেষ এবং অগাস্টের শুরুর দিক। প্রথম দিকে তেমন বৃষ্টির দেখা পাইনি, তবে এর মধ্যে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হয়ে গেছে বেশ কয়েক বার, তাই আধ ভেজা বর্ষাকাল বলা যেতেই পারে।

অনুরাধা, প্রমথেশ, অর্ণব, রাই, আর আমি – এই পাঁচ জনের গ্রুপ আমাদের। আড্ডা দেওয়া, কলেজ ডুব দেওয়া, সিনেমা দেখা ইত্যাদি সব জায়গায় আমরা একসাথে পঞ্চপান্ডব। কাকিমা, মানে অনুরাধার মাই তো আমাদের নাম দিয়েছিলেন পঞ্চপান্ডব।

আমাদের এই বন্ধুদের গ্রুপ কাকিমার হাতের অতীব লোভনীয় রান্না খেতে মাঝে মাঝে হাজির হতাম অনুরাধাদের বাড়ি। তবে কাকিমা মোটেই বিরক্ত হতেননা, বসিয়ে বসিয়ে কত খাবার খাওয়াতেন তার হিসেব নেই।

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

অনুরাধা প্রস্তাব দিয়েছিল কাছাকাছির মধ্যে বকখালি ঘুরতে যাওয়ার কথা, আগের দিন সকালে যাবো পরদিন সকালেই রিটার্ন। তবে বৃষ্টির মধ্যে সমুদ্র দেখা বড্ড বাজে প্ল্যান, অর্ণব অন্য কোথাও যাওয়ার কথা বললো, কিন্তু কোথায় যাব সেটা সে আর বলতে পারলো না। প্রমথেশ বলল, সত্যি বলতে কি বর্ষা কাল কোথাও ঘুরতে যাওয়ার জন্য আইডিয়াল সময় না, তবে আইডিয়াল সময়ের অপেক্ষায় থাকলে আমাদের থার্ড ইয়ারের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। তাই ওই বৃষ্টির কথা ভুলে মা কালীর নাম নিয়ে কোথাও একটা বেরিয়ে পরি। আমরা একে একে অনেকগুলো ঘুরতে যাওয়ার জায়গার নাম বললাম যেখানে একটা রাত আমরা কাটাতে পারব, কিন্তু কোনোটাই সকলের মনের মতো হলো না, কারো না কারো কিছু না কিছু আপত্তি থেকেই যাচ্ছে। রাই এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, আমাদের আলোচনা শুনছিল, অবশ্য এমনিতেই ও একটু কম কথা বলে। গ্রুপের মধ্যে আমার নাম বদনাম আছে বেশি বকবক করার জন্য, আর রাইএর বদনাম চুপ করে থাকার জন্য।

সমস্ত আলোচনাতে বিরতি কেটে, রাই বললো, আমি একটা জায়গার নাম বলি, তোরা যদি যেতে ইচ্ছুক থাকিস। অর্ণব বললো, বলে ফেল আমরা তো চাইছি একটা জায়গা, আর একটু রিফ্রেশমেন্ট। রাই বললো, জায়গাটা বেশি দূর নয় আবার খুব কাছেও নয়, হাসনাবাদ লাইনে টাকি। টাকি

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

নামটা শুনেই অনুরাধা আর প্রমথেশ একেবারে নাক শিটকে বললো, মাথা খারাপ এই জল কাদায় আমরা যাবো ওই হদ্দ গ্রামে, কক্ষনো না, হ্যাঁ মানছি টাকি খুব সুন্দর এবং গ্রাম্য পরিবেশ – তবে এই বর্ষায় কোনোভাবেই আমি ওই দিকে যাবনা। অর্ণব ও একই সুর গাইল, আর মেজরিটি মাস্ট বি গ্র্যান্টেড বলে একটা কথা আছে তাই আমিও বেশির দিকেই যোগ দিলাম, যদিও আমার কোনো আপত্তি ছিলনা। আমার কাছে বর্ষা বৃষ্টি কোনো ম্যাটার করেনা ঘুরতে যাওয়াটা বড় কথা।

আলোচনাটা চলছিল অনুরাধার বাড়িতে। ছাদের চিলে কোঠার পাশে অনুর স্বপ্নের ছোট্ট ঘর, কাকাবাবুর কাছে বায়না করে এই ঘরটা সে বানিয়েছে, তত বড় বাড়ি না হলেও গন্ডা খানেক ঘর আছে। তবুও মেয়ের ইচ্ছে ছাদে তার ঘর চাই, সে নাকি বৃষ্টি দেখবে আর গান শুনবে, যখন রাত্রি বেলায় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আসবে সে জানলা খুলে দেবে। কবি মেয়ের বায়নাতে কাকু আর না করতে পারেননি, তাই দোতলা বাড়ির ছাদের এক পাশে আলিশান ঘর বানানো হয় অনুর জন্য।

ঘরটা আমাদেরও খুব প্রিয়। এবার একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসলো ঘরের মাঝে, বাইরে তখন মুষুল ধারায় বৃষ্টি, পড়ন্ত বিকেলের আভা নেমে এসেছে জানলায়, এর মধ্যে কাকিমা আমাদের জন্য গরম গরম চা আর লাউ পাতা দিয়ে চিকেন স্টাফিং করা নতুন একটা পাকোড়া রান্না করে পাঠিয়েছেন।

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

আমরা আলোচনা ভুলে মন দিলাম খাবারে। খেতে খেতে এবার রাই বললো, তোদের টাকি যাওয়ার প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম অন্য একটা কারণে, এই বর্ষা কালে যে ঘুরে ঘুরে গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখা যাবে না – সেটা তোদের থেকে আমি ভালো জানি, কারণ আমার বাড়ি টাকিতেই। ছোটবেলার অনেকটা সময় আমি ঐখানে কাটিয়েছি বাবা ছিলো ঐখানের স্কুলের শিক্ষক, আমার যখন মাধ্যমিক শেষ হয়, তখন আমরা এই যাদবপুর চলে আসি, বাবা বদলি হয়ে যায়। তবে আমার কাকু, কাকি, দাদু, ঠাম্মা এখনও ঐখানেই থাকেন।

অর্ণব বললো, আচ্ছা আগে তো কখনো বলিসনি টাকিতে তোর দেশের বাড়ি। আমি বললাম, ওর পেটে ব্যাথা হলে সেটাই বলে না, তা নিজের দেশের বাড়ির কথা বলবে কি? কথাটা শেষ হতেই আমরা সকলে হেসে উঠলাম।

মুচমুচে লাউ পাতার পাকোড়াতে একটা কামড় বসিয়ে, প্রমথেশ বললো, আচ্ছা বললিনা তো আমাদের হঠাৎ টাকি যাওয়ার প্রস্তাব তুই দিলি কেন? গরম চায়ে চুমুক দিয়ে, রাই বললো, তোদের মধ্যে প্রায়ই শুনি একটা আলোচলা হয়, তোরা ভুতুড়ে জায়গা ভিসিট করতে চাস, সেই কলেজের প্রথম থেকেই শুনে আসছি, তবে তোদের কোনো দিন প্ল্যান করে যেতে দেখিনি। এই ইচ্ছেটা আমারও আছে, তাই ভাবলাম রথ দেখা কলা বেচা দুটোই

একসাথে হয়ে যাবে। আমি পাকোড়া চিবোতে চিবোতে বললাম, রাই ব্যাপারটা খুলে বলত।

আমাদের সকলেরই বেশ আগ্রহ এই বিষয়টাতে, শুধু অনুরাধা একটু পিছপা হয়, বাকি আমরা সবাই একদম সম্পূর্ণ আগ্রহ নিয়ে রাইকে চেপে ধরলাম। রাই বললো, টাকি রাজবাড়ির কথা তোরা সকলেই জানিস, কিন্তু ঐখানে শুধু একটা রাজবাড়ি বা একটা জমিদার বাড়ি নেই, আরও কিছু ভগ্নপ্রায় পুরনো বাড়ি আছে। সেইগুলোর মধ্যেই একটা বাড়ি – যেটার খুব বদনাম আছে ভুতুড়ে বাড়ি বলে। সেটা বসতি এলাকার থেকে বেশ দূরে এবং লোকজনের চলাচল খুব কম, কিন্তু মজার বিষয় হলো, বাকি সব পুরনো বাড়িগুলোর মত সেটার দশা খারাপ না, বেশ শক্তপোক্ত ভাবে মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে।

শুনেছিলাম আগাছার জঙ্গলে ভরে গেছে, তবে ওটা এখন পিকনিক স্পট হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়, তাই ভেতরে দুই একটা ঘর পরিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু শুধু দিনের বেলা, রাতে কোনোভাবেই ওই চৌহদ্দিতে ঢুকতে দেওয়া হয়না কাউকে। স্থানীয় লোকজনের কাছে জানতে পারা যায়, সন্ধ্যে নামার সাথে সাথে ওই পুরনো বাড়ির চত্বর একদম ফাঁকা হয়ে যায়, ঐদিকে কেউ যায় না, ওই পুরনো বাড়ির ঘরে নাকি পায়ের নূপুরের শব্দ পাওয়া যায় সারা রাত।

...ক্রমশ ■

কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে সুরক্ষিত, মুর্শিদাবাদ থেকে প্রাপ্ত, চন্দনকাঠের দুর্গা প্রতিমা।

Image Courtesy: শক্তিশেল

Source:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Debi_Durga_Sculpture_by_Sandalwood_Murshidabad_WB_30_01_2018.jpg

বিষশ কোরমা মাইকি জয়

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

সেপ্টেম্বর মাস থেকেই বাঙ্গালীর পুজোর আনন্দ শুরু হয়ে যায়। বাবা বিশ্বকর্মা এসে ফিতে কাটেন। সেই যে ঢাকে কাঠি পড়ল, ব্যাস একেবারে মা কালীকে দিয়ে শেষ হবে।

বাবা বিশ্বকর্মা নাচতে নাচতে আসেন আর যান। না, মানে তিনি নিজে নাচেন না, তাঁর ভক্ত কুল তাঁকে আনার সময় পেটে কিঞ্চিৎ কারণ ঢেলে এবং যাওয়ার সময় কিঞ্চিৎ পরিমানে বেশী ঢেলে, নদী নালা পুকুর যে যেমন পারে ঠেলে ফেলে দেয়। বাবা বিশ্বকর্মা কি করে যে শুধু শ্রমিক শ্রেণী বা রিক্সাওয়ালার ঠাকুর হলেন তা বোধকরি তিনি নিজেও জানেন না। আর জানবেনই বা কি করে! স্বর্গে গমনের পর তাঁর মূর্তি যে ভাবে বিসর্জন হয় তা যদি তিনি দেখতেন তবে বোধকরি মর্তে আসা বন্ধ করতেন।

এই একটা দিনে ঘরের লক্ষী থেকে রাজ্য প্রশাসন পর্যন্ত কারণ সেবায় বারণ করেন না। সন্ধ্যেয় যখন বাবাকে ভাসান দিতে নিয়ে যায় তখন কাকে কোথায় নিয়ে চলেছে সেটাই ভুলে যায়। পা মাটিতে পরে বটে তবে কোথায় পরে তা তারা জানে না। সঙ্গে ব্যাকরণহীন উদুম দুম নাচ কমপালসারি, আর থেকে থেকে বাবা বিষশ কোরমা মাইকি

জয় ধ্বনি। কারণ সেবার কি অপরূপ মহিমা! দু ঢোক পেটে পরলেই বাবা মা হয়ে যান। এই জন্যই বোধহয় বাবা আর ফিরে দেখেননা! এই বাবাই দেখি একটু টাইম মেনটেইন করেন পঞ্জিকার ধার ধারেন না, আবহমানকাল থেকে ১৭ ই সেপ্টেম্বর নিজের জন্য ধরে রেখেছেন। এখন স্বর্গ থেকে দেব দেবীরা মর্তে এসে আর তাড়াতাড়ি স্বর্গে ফিরতে চান না। আসলে স্বর্গেতো মল, ডিস্কো থেক এসব নেই, স্বর্গ থেকে শুধু নিচের মানুষ গুলোকে নাচানো যায়। নাচানো যায় বলে কি নিজের একটু নাচতে ইচ্ছে করে না? ব্রহ্মার ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারেন না তাই মর্তে এসে মনের সুখে একটু নেচে কুদে দুটো দিন একটু মস্তি...

যে কথা বলছিলাম, এই তো গেল বছরেও টালিগঞ্জে এক বন্ধুর গ্যারেজে বাবা বিশ্বকর্মা প্রতিবারের মতোই এসেছিলেন। বন্ধুটি আমাকে আগে থেকেই নেমন্তন্ন করে রেখেছিলো। দুপুরে ওর গ্যারেজেই মধ্যাহ্ন ভোজের বন্দোবস্ত ছিল। পুজোর ব্যাপার হলে আমি একটু দেরি করেই যাই, মানে পুজো শেষ হলে তবে। যথারীতি বন্ধুর গ্যারজের দরজাতে পা পড়তেই বন্ধুর হুঙ্কার – এত দেরি করলি? বললাম – বাবা এবার ঘরে ঘরে এসেছেন তাই রাস্তায় জ্যাম। বন্ধুটি তাড়াতাড়ি আমাকে এক ফ্যানের নিচে নিয়ে গিয়ে বসালো। অনেক কিছুই বললো, কিন্তু কিছুই শুনতে বা বুঝতে পারলাম না, শুধু বোকার মত বত্রিশ পাটি

বের করে দিলাম। মনে মনে বললাম নরকের জ্বালা বোধহয় এর থেকে সহনীয়। উচ্চস্বরে বিশাল বক্সে গান বেজে চলেছে। মনে হচ্ছে টালিগঞ্জ থেকে তিন কিলোমিটার দূরে কালীঘাটে মা কালীকে গান শোনাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। বন্ধুটি ছুটে এসে পাকড়াও করলে। বললে – কি রে না খেয়ে চলে যাচ্ছিস? বললাম – ভাই রক্ষে কর, তোর গানের গুঁতোতে আমার প্রাণ পাখী গত হতে বসেছে। সে ছুটে গিয়ে আওয়াজ কিছুটা কমালো। কানের মধ্য তখনো গোঁ গোঁ করছে। সেটা হিন্দি গান নাকি বাঙ্গলা নাকি রাস্তার বাসের হর্ণ বুঝতে পারছি না। তেষ্টাও পেয়েছে। হাতের ইশারায় ডেকে জল চাইলাম। সে এক গাল হেসে আমাকে একটা ঠান্ডা পানীয়ের বোতল ধরিয়ে তেমনি হাসতে হাসতে চলে গেল। গলায় বেশ কিছুটা একসাথে চালান করে, মনে হলো কিছু একটা গন্ডগোল আছে। বোতল হাতে করে বসে আছি, বন্ধুটি কিছুক্ষণ পর এসে বললো, কি রে বসে আছিস? খেয়ে নে।

বললাম ভাই কিছু মনে করিস না, মালটা ডুপ্লিকেট। এবার সে তার বত্রিশ পাটি বিকশিত করে বলল, ওতে একটু সাহেবদের শরবৎ মেশানো আছে। এক রকম জোর করেই সে আমাকে ঠান্ডা পানীয়ের বোতল খালি করিয়ে বলল চল একসাথে খেয়ে নিই। ঠিক আছে বলে উঠতে গিয়ে মালুম হলো – যাকে এতক্ষণ ধরে গলাধঃকরণ করেছি সে এবার

নড়াচড়া করছে। খেতে বসে মাংস যা খেলাম তাতে মনে হলো মাংস নয় পুরো খাসিটা একাই খেয়ে ফেলেছি। খাওয়া তো হলো এবার বাড়ী ফিরবো কি করে?

আমার তো আর রিক্সা নেই যে আমার গৃহলক্ষ্মী আমায় ছাড় দেবেন। তিনি আবার কালী মায়ের পূজা করেন। হয়ত মায়ের খাঁড়াটা নিয়েই তিনি তেড়ে আসবেন! আর হাতের কাছে খাঁড়া না পাওয়া গেলে নিদেনপক্ষে ঝাঁটা তো থাকবেই। অনেকক্ষণ ভেবে একটা বুদ্ধি ঠিক করলাম। পাশেই রিজেন্ট পার্কে মাসতুতো ভাইয়ের বাড়ী, ওর বাড়ীই চলে যাই। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আর দেরি করা ঠিক হবে না। যথারীতি মুঠো ফোনে গৃহলক্ষ্মীকে সুন্দর করে মিথ্যা কথার সুন্দর এক মালা উপহার দিয়ে ভাইয়ের বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলাম।

বনেদি পাড়া, বহুদিন পরে ভাইয়ের বাড়িতে এলাম। পার্কের সামনে বিশাল বাড়ি, বাড়ির সামনে বড় বড় গাছ। বেশ মনোরম পরিবেশ। চওড়া রাস্তা। পিচের রাস্তায় কি সুন্দর আলপনা দেওয়া। এত বড় আলপনা কে দিয়েছে কে জানে! কোনমতে ভাইয়ের ঘরে ঢুকে সোফায় গা এলিয়ে দিলাম। বৌমাটি ভারী মিষ্টি এবং রসিক। মুচকি হেসে বললো নির্ঘাত বাবার প্রসাদ খেয়েছো। বোকার মতো দাঁত বের করে বললাম – না সাহেবদের শরবৎ। জানতে চাইলাম ভাই কোথায়? বৌমা বলল – ও তোমার মতোই শরবৎ খেয়ে নাক ডাকছে, তুমিও ওর পাশে গিয়ে শুয়ে পর।

কারণ সুধা

কেন যে বৌমাটি টিয়ে পাখি নিয়ে ফুটপাতে বসে না! মুখের কথা একবারে পেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনে। ভাইয়ের পাশে গিয়ে একেবারে সটান। মাভৈ, সাহেবদের শরবৎ। এক ঘুমে রাত পার। এর কি মাহাত্ম্য!

এই যে দুজনেই উঠে পর চা রেডি। দুভাই দুজন দুজনার দিকে তাকিয়ে একটা বোকা হাসি হাসলাম। চা খেয়ে দুজনে দু বাথরুমে ঢুকে ছোটলোক থেকে ভদ্রলোকে রূপান্তরিত হয়ে ব্রেক ফাস্ট করে বের হলাম। বাড়ির সামনের রাস্তাটি কাকের বিষ্ঠাতে ভর্তি। কোন ছিড়ি ছাঁটা নেই। কোলকাতার বাঙ্গালী কাক। পেটে এ্যামোবায়োসিস জিয়াডিয়াসিসে ভর্তি। হয় কনস্টিপেশন নয় তো লুজ মোশান। মাঝামাঝির কোন সিন নেই। দেখে মনে হচ্ছে হাই ডোজে জোলাপ খেয়ে ছেড়ে দিয়েছে। হায় বাবা বিষশ কোরমা, গত রাতে এটাকেই আলপনা ভেবেছিলাম!

চৈত্র মাস পার কে বলে, শুধু চাঁদি কেন একেবারে পেছন পর্যন্ত ফাটছে রোদের তেজে। ঘরে ঢোকার সাথে সাথে গৃহলক্ষ্মী বললেন – এই তুমি তো তৈরীই আছো, আমি বেড় হচ্ছিলাম চলো না একসাথে গিয়ে ভাইয়ের মেয়েটার জন্য কিছু একটা কিনে আনি। আমার এদিকে ফাটছে আর ওদিকে তার মন একেবারে মধ্যরাতের ডিস্কোথেক। মনে মনে বলছি গতকাল যে মিথ্যা কথার মালা পড়িয়েছি তার সব ফুল এখনো শুকায়নি। অগত্যা! ■

দেবীপক্ষের সেকাল

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

শহর কলকাতার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে আজও প্রাণে পুলক জাগায় দেবীপক্ষের আরাধনা। তবে শহরের ব্যস্ততার মাঝে দুর্গাপুজো এখন শুধুই জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব। সময়ের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় পুজোও এখন সমান প্রতিযোগী। সেকালের আর একালের পুজোর ঘ্রান-স্বাদ-আহ্লাদ সব কিছুরই বিস্তর পার্থক্য ঘটে গিয়েছে। বয়স্কদের সেই ফেলে আসা স্মৃতির ঝাঁপি হাতড়ালে খুঁজে পাওয়া যায় সেকালের শহর কলকাতার দুর্গাপূজার ইতিবৃত্ত।

শরতের শিশির ভেজা শিউলি ফুলের অরুণ ভোরে সূচনা হয় দেবীপক্ষের। শ্রী শ্রী চণ্ডীপাঠের মধ্যে দিয়ে দেবী দুর্গার আবাহনই মহালয়া নামে পরিচিত। শহর কলকাতায় দুর্গাপূজা শুরু হয় সাবর্ণ রায়চৌধুরীর পরিবারের পুজো দিয়ে। এরপর বাড়ি ভিত্তিক পুজোর গণ্ডি পেড়িয়ে, ১৯১০ সাল নাগাদ এই দুর্গাপূজা বারোয়ারি পুজোর রূপ নেয়। তাই বলা যায়, তখনও দুর্গাপূজা বাঙালির একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে ১৯২৬ সালে প্রথম সিমলা স্ট্রিট আর বাগবাজারে আয়োজিত হয়েছিল

সার্বজনীন দুর্গাপূজা। এরপর থেকেই এই পুজো শহর কলকাতায় সার্বজনীন পুজোয় পরিণত হয়।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে দুর্গাপূজার আদব-কায়দা ছিল একটু ভিন্ন রকমের। হয়তো এখনকার মতো বিলাসবহুল সৌখিনতা ছিল না, তবে ছিল সর্বস্তরে আনন্দ ও ভক্তিভাবের নিখাদ প্রকাশ। সেইসময়ে এতো বেশি যান্ত্রিক আলোকসজ্জা বা বৈভবের আতিশয্য ছিল না। বরং অন্তরের আধ্যাত্মিক ও আন্তরিক আবেদন ছিল। কোনরকম থিম ভিত্তিক নয়, একটা সাদামাটা প্যান্ডেলে কুটির শিল্পের কারুকার্য – প্যান্ডেলকে প্রাণবন্ত করে তুলত। একচালা প্রতিমার মৃন্ময়ী রূপে ছিল প্রাণবন্ত দেবী আরাধনার মন্ত্রমুগ্ধতা। পুজোর চারটি দিন পাড়ার সকল ছোটোবড়ো সদস্য-সদস্যারা সমানভাবে অংশগ্রহণ করত। তবে কচিকাচাদের মধ্যে আনন্দের আপ্লুতা ছিল একটু বেশি। পোশাক একটা কি দুটো তা নিয়ে দড়াদড়ি বা প্রতিযোগিতা ছিল না। প্রত্যেক প্যান্ডেলে স্বেচ্ছাসেবী কাজে দেখা যেত উৎসাহী ছোটোদের। সে প্রসাদ বিতরণই হোক কি অন্য কোন কাজ হোক না কেন। বহু প্যান্ডেলে কাঙালি ভোজনও করানো হতো। যা এখন অনেকটা জনসাধারণের সখের ভোজনে পরিনত হয়ে গেছে। হয়তো জনসংখ্যার অগাধ ভিড়ে হারাতে বসেছে হার্দিক অন্তরের আবেদন...

বিবর্তন

দেবীর আরাধনার মাঝে যেমন জড়িয়ে ছিল ভালবাসার বাঁধন, তেমনই সাংস্কৃতিক যোগসূত্রও ছিল সুদৃঢ়। মা দুর্গা বিদায়বেলায় আয়োজিত করা হতো বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গান, নাচ, পালাগান, যাত্রায় দেখা যেত বহু নামী গুনী শিল্পীদের। নানান পৌরাণিক বিষয়কে কেন্দ্র করে যাত্রাপালা আয়োজিত হতো। সিঁদুরে-আবীরে মায়ের বিজয়া শেষে, আবার একটি বছরের অপেক্ষা...

আবার একটি বছরের অপেক্ষা আজও হয় বা ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু বাঙালি হৃদয়ে সেই মা দুর্গার আরাধনার প্রতি আত্মগত শ্রদ্ধা, ভক্তি, আর প্রতিটা মানুষের মেলবন্ধন নেই। যা আছে তার বেশিরভাগটাই কৃত্রিম, বিবেকহীন ভণ্ডভক্তি। সেকাল-একালের চলন-ধরন, ভাবে-অভাবে এক বিশাল ব্যবধান থাকলেও, আজও কালিমাখা শরতের এক চিলতে সোনালী মেঘের দিকে কান পাতলে শুনতে পাওয়া যায়:

নমঃ আয়ুর্দ্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে ।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাশ্চ দেহি মে ।।

হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাসুখম্ ।
হর রোগং হর ক্ষোভং হর মারীং হরপ্রিয়ে ।।

সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ধনং দেহি সদা গৃহে ।
ধর্ম্মার্থকামসম্পত্তিং দেহি দেবী নমোস্তু তে ।। ■

এক টুকরো স্মৃতি

সোম মিত্র

এখন ভোর ৩ টে ৩০। ভাল করে ভোরের আলো ফোটেনি। আধো আলো আর আধো ছায়াতে বিছানা ছাড়লাম। হ্যারিকেনের আলোটা প্রায় নেভার মতো। এক-পা, দু-পা করে এগিয়ে গিয়ে হ্যারিকেনের আলোটা বাড়াতেই, একটা হলুদ রঙের আলো ঘরের নিকষ কালো অন্ধকারকে অনেকটা কমিয়ে দিলো।

ভোর ৩ টে ৪৫ এখন। ঘরের ভেতর থেকে একটু বাইরে দালানে এলাম। বাইরেরটা কেমন একটা শীত-শীত ভাব। শরতের ভোর এমনই হয়। চোখে মুখে একটু জলের ঝাপটা দিতে বেশ সতেজ লাগছে। এগিয়ে গেলাম রেডিওটার দিকে। তখনও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি এমন গ্রামের ছেলে আমি। রেডিওর আওয়াজ ছিলো বহিঃ জগতের ভেসে আসা তরঙ্গ। সারা বছর নিরলস ভাবে রেডিও আমাদের বিনোদন দিত, খবর দিত। সারা বছর যতই তার পরিচর্যা না হোক, কিন্তু একটা সময়ে হঠাৎই তার কদর বেড়ে যেত। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, মহালয়ার সময়। মহালয়ার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই পাড়ায়,পাড়ায় রেডিও সারাবার দোকানে ভিড়। যদি কিছু ত্রুটি থাকে তা সারাই করে নেওয়াই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। মহালয়াতে কোন বিঘ্ন ঘটলে চলবেনা।

এখন ভোর ৩ টে ৫০। পাড়াটা আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। সব জালানা দিয়ে ঠিকড়ে পড়ছে হ্যারিকেনের হলুদ রঙের আলো। এ আলো নিয়ন বাতির মতো মায়াবী। ইতিউতি জোনাকির আলো। দূরে কোথাও কুকুরের ডাক, ভোরের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ছড়িয়ে পড়ছে। নিশুতি পাড়াটা আস্তে আস্তে মুখরিত হচ্ছে। মৃদু গুঞ্জন।

ভোর ৩ টে ৫৫ এখন। একে একে বোবা রেডিওগুলো সবাক হয়ে উঠছে। গোটা পাড়াটা গমগম করছে। সমবেত রেডিওগুলো একই সুরেই বেজে চলেছে। সাথে আমাদের রেডিওটাও।

এখন ভোর ৪ টে।

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।..."
"বাজলো তোমার আলোর বেণু, মাতলো যে ভুবন..."

আজ 'মহালয়া'। ■

दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ।
ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः ॥

या देवी सर्वभुतेषु चेतनेत्यभिधीयते ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥

আশ্বিনের শারদপ্রাতে

অমিত নাগ (আমেরিকা)

একটা উজ্জ্বল আলোয় ঘুম ভেঙে চোখ খুলে দেখলুম বেলা হয়ে গেছে বেশ। মাথার ওপর দিয়ে ঘুলঘুলি থেকে আসা সূর্য্যের আলো উল্টোদিকের দেওয়ালে কতকগুলো গোলগোল স্থির আলোর চাকতি তৈরী করেছে। সেই আলোর বৃত্তে মাঝে মাঝে কিসের যেন ছায়া এসে পড়ছে। বোধহয় ঘুলঘুলিতে বাসা করা পায়রাগুলো হবে। ওদের অদ্ভুত ঘুরুর ঘু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। একদিকের ঘুলঘুলি থেকে অন্যদিকের দেওয়ালে চলে যাওয়া আলোর রেখার দিকে মন দিয়ে তাকালে দেখা যাচ্ছে ভাসমান ধুলিকণা। এমনি সময়ে বাতাসে ধুলিকণা দেখতে পাইনা, শুধু এই আধো-বন্ধ ঘরে সকালের বা বিকেলের পড়ন্ত হেলে থাকা সূর্য্যের আলোয় দেখা যায়। অবাক লাগছে ভেবে – এত বেলা হয়ে গেলো কেউ ডাকেনি কেন!

রান্না ঘরে ছ্যাঁকছুক আওয়াজে রান্না হচ্ছিলো। দুধ দিতে আসা ছেলেটি বারান্দায় ঘটাং করে দুধের বালতি বসাতেই হ্যান্ডেলটা ঠঙ করে বালতির গায়ে এসে বসলো। মা দুধওয়ালাকে বলছে – এ সপ্তাহ আর পরের সপ্তাহটায়

একটু বেশি করে দুধ দিয়ে যেতে। পুজোর মাস, দুধ একটু বেশি লাগে। এক মুহূর্তে সব কিছু মনে পড়ে গেল। অনেক ভোরে বাবা জাগিয়ে দিয়ে রেডিওটা চালিয়ে দিয়েছিল। আকাশবাণীর সিগনেচার টিউন, দেবীবন্দনার পরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর আবেগঘন গলায় সেই পাঠ: "আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর ধরণীর বহিরাকাশে অন্তর্হিত মেঘমালা প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা।"

শেষ অবধি শুনতে পারিনি, খানিক বাদেই ঘুমে চোখ ঢুলে এসেছিলো। শুধু সেই গানটা জেগে উঠেও ফের মাথার মধ্যে ফিরে এসেছে। "বাজলো তোমার আলোর বেণু মাতলো যে ভুবন..."

আজ সকালটা সত্যি যেন আলোয় আলোয় ভরে গেছে। আজ মহালয়া। পাঁচদিন পরেই পুজো শুরু। নিচু ক্লাসের কারো কারো ছুটি পড়ে গেছে স্কুলে। উঁচু ক্লাসেও পড়লো বলে দু-তিন দিনের মধ্যে। আর স্কুল খোলা থাকলেও পড়াশুনোর চাপ নেই তেমন। মাস্টারমশাইরা ক্লাসে ক্লাসে পূজোর ছুটির হোমওয়ার্ক দিয়ে নতুন কিছু না পড়িয়ে একটু হালকাচ্ছলে কাটিয়ে দিচ্ছেন বাকি সময়টা। হয়তো কেউ ভালো আবৃত্তি বা গান করে, তাকে বললেন একটি আবৃত্তি বা গান করতে। যে ভালো নাটক করে তাকে তার করা নাটক থেকে একটু সংলাপ বলতে বলা হলো। এখন শুধু

আনন্দ করার সময়। বাড়ির লোকেরাও সে খবর পেয়ে গেছে বোধহয়। তাই আর সকাল সকাল ঘুম থেকে ডেকে তোলার প্রয়োজন বোধ করেনি।

কুয়োতলার ধারে পাঁচিল ঘেঁষে বেড়ে ওঠা পাশের বাড়ির শিউলি গাছ থেকে টুপটাপ খসে পড়েছে কিছু শিউলি ফুল ভিজে মাটির ওপর। ওদের শিউলি আমাদের প্রাচীরের বাধা মানেনা। তাই দু একটা ডালসমেত পাঁচিল টপকে আমাদের ফুল দানে হস্ত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে গাছটা। বাতাসে একটু যেন হালকা ঠান্ডা ভাব। শিউলি ফুল সাদা অথচ দুধসাদা নয়। আর একখানা কমলা রঙের বোঁটা সমেত অনন্যসাধারণ এ ফুল। পুজোর বার্তাবাহক। দুটো ফুল তুলে দেখছিলাম নিবিষ্ট মনে। পাশের বাড়ি থেকে আসা হৈ হট্টগোল আর হাসির আওয়াজে তাকিয়ে নজরে আসে, ওদের টালির চালে হাই হীল আর স্ল্যাক্স শার্ট পরা দুর্দান্ত সেই মেয়েটা হাসছে আর নিচে থেকে বড়রা চিৎকার করছে পড়ে যাবি পড়ে যাবি বলে। ওরা বোম্বেতে থাকে। এটা মামার বাড়ি। পুজোয় এসেছে। বোম্বে থাকে মানেই সিনেমার লোকেদের চেনে বলে আমাদের ধারণা। চাকরি করতে কজনই বা আর বোম্বে যায়! তা ছাড়া বোম্বের অধিকাংশ পরিচালক, মিউজিক ডিরেক্টর কলাকুশলী তো বাঙালি। এই তো সেদিন পাড়ারই এক জন বেকার ছেলে ভাগ্য ফেরাতে, ফিল্ম লাইনে কিছু একটা করার জন্য বোম্বে

মেলে চড়ে বসল। ওর বন্ধুরা ফেয়ারওয়েল হিসেবে দিল দু পাউন্ড পাউরুটি, কয়েকটা বাপুজি কেক আর কয়েক প্যাকেট সিগারেট। পথে যাত্রায় কাজে লাগবে।

টিভির চিত্রহারে গান শোনার সময় নাম দেখায় নির্মাতা, সংগীতকারের। সেখানে বাঙালি নাম অনেক দেখেছি। আর সেই সব গানে দেখা আশা পারেখ, শর্মিলা, সাধনা, তনুজার মতো টেপা স্ল্যাক্স আর জামা পড়েছে মেয়েটা। অসম্ভব স্মার্ট দেখাচ্ছে। হবেই তো, বোম্বেতে থাকে যে। তাকিয়ে ছিলাম, যদি চোখাচোখি হয়ে যায় একবার। টালির ছাদে লাউ ডগা উঠছে সবে। কচি লাউগাছ, সদ্য বেড়ে ওঠা। লাউ হতে এখন অনেক দেরি, একটু ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া বইলে তবে হয়তো হবে। মেয়ে সে কথায় কান দেয়নি, ছাদে উঠে দেখতে চায় ফুল ফুটেছে কিনা। হেলে পড়া টালির ছাদে কোমরে হাত দিয়ে সায়রা বানুর স্টাইলে পাড়ার চারিদিক দেখতে দেখতে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বললো, কি রে, কি দেখছিস। ওর উচ্চারণটা যেন কি রকম। একটু টান আছে বোধহয়, আর সেই জন্যই কিরকম অন্যরকম মিষ্টি শোনায়। দুদিন আগে পাড়ার প্রতিবেশী কাকিমা মানে ওর মামিমা, ক্যাজুয়ালি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো। একটু যেন কেঁপে উঠেছিল বুক। হয়তো দু এক বছরের বড় আমার থেকে। প্রথম আলাপেই বললো তোর নামটা বেশ সুইট। হতেই পারে একটু বড়। তা বলে প্রথম আলাপেই তুই!

তুমি বলতে পারতো, খানিকটা সমান সমান মনে হতো। তুই বললে তো আর অন্য কোনো সম্পর্কের সম্ভাবনাই থাকে না।

যারা বাইরে বা বিদেশে থাকে তাদের অনেকেরই এটা দেশে ফেরার সময় – ছুটি কাটানোর জন্য। কুণ্ডুদের বাড়ির সেজকাও আসে জার্মানি না কোথা থেকে। ইঞ্জিনিয়ার, অনেক দিন ওদেশে আছে। প্রতিবার আসার সময় বাড়ির ছেলেদের ছাড়াও, বাড়ির ছেলেদের বন্ধু আর আমার মত পাড়ার ছেলেদের জন্যেও আনে অদ্ভুত আশ্চর্য্যজনক সব খেলনা আর উপহার। এবার নিয়ে এসেছে চকলেট। ক্যাডবেরির মতো আবার ঠিক ক্যাডবেরি নয়। ওপরে লেখা বনবন। কি অদ্ভুত নাম, শুনলে হাসি পায়। জার্মান ভাষায় চকলেটকে নাকি বনবন বলে। ওদের ছোট্ট ছেলেটা বাংলা বলতে পারে না ভাল। চকোলেট খেতে চেয়ে বলে, বনবন ঠাও।

পাড়ার ক্লাববাড়িটার পাশের এক চিলতে জমিতে প্যান্ডেল হচ্ছে কদিন ধরে। প্রথমে বাঁশ পড়লো, তার পর তেরপল। তেরপলে কেমন ধুলোমাখা এক মায়াবী সোঁদা গন্ধ। বাঁশের খাঁচায় কদিন ধরে হেঁটমুন্ড হয়ে খুব দোল খেলো ছেলেরা। এখন সাদা কাপড় আর কুঁচি দেওয়া কাপড়ে ভেতরের দেওয়াল সাজানো হচ্ছে। প্যান্ডেলের ঠান্ডা ছায়ায়, গুলি খেলা হয় এখন। চারদিন পরে কুমোরটুলি

থেকে ঠাকুর আসবে লরি চড়ে। ডেকরেটরদের থেকে আসবে ফোল্ডিং চেয়ার। চন্দননগর থেকে আলোর সজ্জা। আশেপাশের জেলাগুলো থেকে ঢাকিরা আসতে শুরু করে দিয়েছে। বায়নার জন্য হাওড়া আর শিয়ালদাহ স্টেশনের বাইরে ওদের অপেক্ষা করতে দেখেছে বড়রা অফিস যাবার সময়। ঢাকিদের সঙ্গে প্রায়ই আসে একটা ছোট ছেলে, কাঁশি বাজাতে। হয়তো ঢাকির ছেলে, ভাইপো বা নাতি। শহরের পুজো দেখতে আর ফেরার সময় টুকটাক বাজার করার আগ্রহে আসে বোধহয়। হয়ত সঙ্গে আসতে চেয়ে আবদার করে ঢাকির মাথা খেয়ে ফেলেছে সে ছেলে। অথচ শহরে এসে মুখ তুলে তাকাতে পারে না। পূজো প্যান্ডেলে কেমন নতমুখে এক নাগাড়ে হাতের কাঁসি বাজিয়ে যায় ছেলেটা।

প্যান্ডেলের পুজো ছাড়াও দু একটা পুরোনো বাড়ির ঘরোয়া পুজোও হয় বন্ধুদের বাড়ি। ওদের ঠাকুর বানানো হয় ঠাকুর দালানে। সারা বছর যে ঠাকুর দালান পরিত্যক্ত ভগ্ন বলে মনে হয়, সন্ধ্যে বেলা একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে দেওয়া ছাড়া যে পথে আর কেউ পা মাড়ায় না, সেই পলেস্তারা খসা, থামওলা, পঙ্খের কাজ করা জায়গাটা কর্মযজ্ঞের কেন্দ্র হয়ে ওঠে মাস দেড়েক ধরে। বনেদি বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে দেখতে পাই পাল মশাই এসেছেন তার শাগরেদ নিয়ে। তারপর একটু একটু করে কাঠের ফ্রেম

আর তার ওপর খড়ের একচালা কাঠামো দিয়ে শুরু হয় মূর্তি তৈরির কাজ। এক মেটে, দো মেটে হয়ে মাটির কাজ শেষ হয়ে আসতে থাকে। পাশেই ছাঁচে তৈরী হয় ঠাকুরের মাথা। তার পর রঙের পোঁচ। এ সব ঠাকুরের গায়ের রঙ বারোয়ারি পুজোর ঠাকুরের থেকে আলাদা। দুর্গা ঠাকুরের রঙ হলুদ, অসুর কেমন সবুজ রঙের। সিংহের মুখ অনেক সময় ঘোড়ার মতো দেখতে। একটু আলাদা, একটু অন্য রকম। ডাকের সাজ আসে – মাথার মুকুট, বুকের ওপর গয়না। চিৎপুর থেকে আসে টিনের খাঁড়া, ত্রিশূল, চক্র, তলোয়ার। আস্তে আস্তে একজন দুজন করে আসে দিল্লি বোম্বে ছড়িয়ে থাকা আত্মীয়স্বজন। লাল পাড় শাড়ি, খোলাচুল, থালার মতো লাল টিপ আর ললন্তিকা সোনার হার পরা মহিলাদের, আর কুচিওলা ধাক্কাপাড়ের সাদা অথবা কোরা খোলের ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা পুরুষদের হাঁটা চলা বাড়ে ভেতরের ঘর আর ঠাকুর দালানের মধ্যে। পুজো শুরুর আগের দিন রাতে হলুদ বাল্ব বা লম্ফের আলোয়, সুতো দিয়ে বাঁধা ভাঙা ফ্রেমের চশমাপরা পাল মশাই একাগ্র চিত্তে ঠাকুরের চক্ষুদান করেন। লম্ফের আলোয় তার নিজের চোখদুটোও চকচক করে ওঠে। মুখের ওপর বলিরেখার চিহ্ন সমেত, সংসার সংগ্রামে জীর্ণ এতদিন সবার চোখের আড়ালে থাকা অবহেলিত দরিদ্র মানুষটি তখন এক অন্য অচেনা মানুষ।

তখন এখন

নতুন জামা কেনা হয়েছে। টেরিলিন, টেরিকট এসবের চল এখন। যুবকদের বেলবটম প্যান্ট, কোরিয়ান গ্যাবার্ডিন কাপড়ের। সঙ্গে লম্বা ডগ কলারের জামা, কোমরে বেল্ট, রাজেশ বা অমিতাভ মার্কা চুল আর লম্বা জুলফিওলা দাদাদের দেখে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠার ইচ্ছেটা চাগাড় দিয়ে ওঠে। আপাতত মেনে নিতে হয় হাফ প্যান্ট আর পূজোর স্পেশাল চুলের ছাঁট যেটা প্রায়ই হয় বড়দের হুকুমে একরকম নিমরাজি হয়ে মেনে নেওয়া ইচ্ছের থেকে ছোট এক ছাঁট। নতুন শার্ট পিচবোর্ডের টুকরোয় ভাঁজ করে আলপিনে আটকানো থাকে। বারেবারে আলপিন খুলে জামা দেখেও আশ মেটে না। নতুন জুতো মাথার পাশে শুয়ে থাকে সঙ্গে, যে কদিন পারা যায়। ষষ্ঠীর দিন পরে বেরোলে আর মাথার পাশে রাখা যাবে না যে।

বড়দের শাড়ি জামা ধুতি কেনা হয়েছে হ্যারিসন রোডের, কলেজ স্ট্রিট বা হাতিবাগান মার্কেটের নাম করা দোকান থেকে। পুরোনো এই দোকানগুলোই বাড়ির কাছে হয়। গড়িয়াহাটের দোকান তেমন পরিচিত নয় এপাড়ার মানুষদের। বাড়িতে কে যেন নিয়ে এসেছে এইচ. এম. ভি.র শারদর্ঘ্য বইটি। শিল্পীদের ছবির সঙ্গে তাদের পুজোর গানের বর্ণনা থাকে সে বইয়ে। গানের শিল্পীদের ছবি সহজলভ্য নয়। সিনেমার আর্টিস্টদের মতো সিনেমার পোস্টার, প্রসাদ, নবকল্লোলেও ছাপা হয় না। তাই তাদের চেহারা সম্বন্ধে

সম্যক ধারণা নেই তেমন। গান শুনেই এক একজনের এক একটা চেহারা ধারণা করে নিয়েছি। সে কল্পনার সঙ্গে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ছবি কেমন প্রায় মিলে গেলো দেখে অবাক লাগে। শ্যামল মিত্র যেন কল্পনার থেকে একেবারে আলাদা – অথবা সন্ধ্যা মুখার্জী, সেও তাই। আরতিকে আধুনিকা লাগে। পিনটু বাবুর ওই পায়ের কষ্টটার জন্যে মন কেমন করে।

লুচি ভাজার গন্ধ আসছে। মৌরি কালোজিরে কাঁচালঙ্কা সমেত সাদা আলুর তরকারি। মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়ির ভালো খাবার মানেই লুচি, পায়েস, পোলাও, মাংস। এখন অনেক দিন এসব ভালো ভালো খাবার হবে ঘরে ঘরে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসবের সময় এখন। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি। জলখাবার খেয়েই ছুট, ছুট, ছুট... মাঠে আসছে ছেলেরা একে একে। খেলা আছে, গাছে চড়া আছে, পুজো প্যান্ডেলে ঘুরে আসা আছে। কিছু না হলে, ঘাসে শুয়ে আকাশ দেখা আছে। এদিকে কাশফুল দেখা যায় না। তবে পুকুরগুলো বর্ষার পরিষ্কার জলে টইটুম্বুর। সেখানে বেগুনি রঙের পানাফুল ফুটে থাকে। মাথার ওপর আকাশ বুঝি বেশি নীল। পেঁজা তুলোর মতো মেঘেরা অন্য সময়ের থেকে যেন বেশি সাদা। দমদম থেকে আকাশে ওঠা রুপোলি প্লেনেরা সাদা মেঘের ওপর দিয়ে নীল আকাশ চিরে ভূগোলের বইয়ে পড়া অচেনা বিদেশী শহরে উড়ে যায় –

তখন এখন

লন্ডন, প্যারিস, টোকিও, লিসবন, ইস্তাম্বুল। মাঠে শুয়ে পুকুরের পানাফুল, নীল আকাশ, মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে চলা রুপোলি প্লেন দেখতে দেখতে অকারণে আনন্দে ভরে ওঠে মন। এখন দুর্গাপূজোর সময়। এখন শুধুই আনন্দের সময়।

####

আজও আবার ঘুম ভেঙে গেছে ঘর ভরে যাওয়া সকালের উজ্জ্বল সূর্যালোকে। জানলার ব্লাইন্ডসগুলো নামানো হয়নি কাল রাতে। উইকেন্ড বলে আজ ছুটি। ওঠার তাড়া ছিল না। অথচ আজ নাকি মহালয়া। একটু সকাল সকাল উঠে পড়া উচিত ছিল হয়ত! তার মানে আগামী উইকেন্ডে আমাদের শহরের দুর্গাপুজো। পাঁচ দশটা নয় ওই একমাত্র পুজো এদিকে। যাবো কিনা জানি না। অফিসের কাজ বা ট্যুর থাকতে পারে। বরাবরের মতোই সবকিছু – দুদিনেই পাঁচ দিনের পুজো, শাড়ি গয়না সম্ভার প্রদর্শনে ব্যস্ত সুন্দরীদের দল, বাবা মায়ের জোর করে ধরে আনা এদেশে বেড়ে ওঠা অনিচ্ছুক কিছু ছোট বাচ্চা, তাদের কাউকে কাউকে যতদিন ছোট আছে ততদিন চাপিয়ে দেওয়া অনুষ্ঠানে অংশ নেবার দায়িত্ব, স্থানীয় ভারতীয় রেসটুরেন্টের উত্তর ভারতীয় শেফকে দিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে বানানো আধা-বাঙালি খাবার, আর কলকাতা থেকে আসা শিল্পীর গান...

তখন এখন

মোটামুটি প্রেডিক্টেবল অনুষ্ঠান, কোনো বিস্ময়ের অবকাশ নেই। দেশের গানের রিয়ালিটি শো থেকে উঠে আশা ছোট ছোট গায়ক ছেলে মেয়েরা মার্কেটিং, পি-আর, বোঝে। তিরিশ চল্লিশ বছর আগে দেশ ছেড়ে আসা প্রবাসী বাঙালিদের জন্য পুরোনো গান গেয়ে যতটা সম্ভব মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করে। ট্র্যাকে মিউজিক চালিয়ে হেমন্ত, সন্ধ্যা, মান্না, প্রতিমা, আরতির গান গায়। এই তিন চার সপ্তাহ ধরে আমেরিকার শহরে শহরে বাঙালি পুজোর জায়গাগুলোয় গান গেয়ে, টাকা রোজগার করতে এসেছে। হয়তো খানিকটা দায়বদ্ধতা অনুভব করে। তাই চেষ্টা করে আন্তরিক ভাবে। তবু সে গান আসলের মতো হয় না। ফেলে আসা তিরিশ চল্লিশ বছর আগের থমকে যাওয়া দৃশ্যপট, বর্ণ, গন্ধ, অনুভূতির স্মৃতি পুনর্গঠন করা হয়ে ওঠে না সার্থকভাবে। চেনা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার আনন্দ ছাড়া প্রাপ্তির ঝুলি বেশ হালকাই। অনেকেই তাই বলে, ভাবছি এ বছরটা আর পুজো দেখতে যাব না। সমবয়সী দেশের বন্ধুরাও শুনি পুজোয় অনেকে আর কলকাতায় থাকতে চায় না। চারিদিকে ভিড়ভাট্টা, ধুলো ধোঁয়া, শব্দদূষণ, থিম পুজোয় পুরোনো পুজোর সারল্য ও আনন্দ খুঁজে না পাওয়া। ছেলে মেয়েরাও দিল্লী, মুম্বাই, পুনে বা বাঙ্গালুরু প্রবাসী। তাই চলতে থাকে পুজোর সময় কলকাতা ছেড়ে লাভা রিশপ লোলেগাঁও, জলঢাকা তোর্সা মহানন্দার পাড়ে তরাইয়ের জঙ্গলে রিসর্ট বা

বনবাংলোর খোঁজ নেওয়া। অথবা ছেলে মেয়ের শহরে যাওয়ার পরিকল্পনা।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে জানলা দিয়ে ঢুকে আসা আনত আলোকরশ্মির দিকে তাকিয়ে থাকি। সেখানে কোনো ধুলোর কণা ভাসতে দেখা যায় না। এখানকার জানলাগুলো ট্রিপল গ্লাসকভার দিয়ে সিল করা, দরজায় দরজায় ওয়েদার স্ট্রিপ দিয়ে আটকানো, ধুলোর প্রবেশের অধিকার নেই। বাড়িতে পোষ্য কুকুর নেই, কার্পেট ভ্যাকুয়াম ক্লিন করা আর সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনার এর এয়ার ফিল্টার পাল্টানো হয় নিয়মিত। সূর্য্যের আলোয় ধুলো দেখতে পাই না ছোটবেলার মতো। জানলা দিয়ে বাইরে দেখতে পাই গাছের পাতা বাদামি, কমলা আর হলুদ হয়ে আসছে, হেমন্তকাল এসে যাচ্ছে দ্রুত। সকাল বেলায় বাতাসে হালকা শীতের কামড় অনুভব করা যায়। জানলা দিয়ে ফল কালারের মেপল গাছ, সবুজ রঙের ডগলাস পাইনের ফাঁক দিয়ে দূরে প্রতিবেশী বাড়িটার ঢালু ছাদ দেখা যাচ্ছে। চারিদিক শান্ত, সূর্য্যের আলোয় উজ্জ্বল। সব কিছু ছোটবেলায় দেখা বিদেশী ম্যাগাজিনের ছবি বা পেন ফ্রেন্ডের পাঠানো পিকচার পোস্ট কার্ডের মতো সুন্দর। এখন দুর্গাপুজোর সময়। তবু আগের মতো আনন্দ বা উত্তেজনা বোধ করি না। এখনকার পুজো না দেখতে পাওয়ার আক্ষেপও হয়না বিশেষ, অথবা হয়ত হয় একটুখানি। তবে সে ফেলে আসা পুরোনো পুজোর

দিনগুলির জন্যে। আজকের ছবির মতো শান্ত ঠান্ডা সুন্দর সাজানো সকালটিতে, ঘরে ঢুকে পড়া ধুলোহীন আনত আলোকরশ্মির দিকে তাকিয়ে আলস্যভরে আরেকটু সময় বিছানাতে কাটিয়ে নিতে নিতে ফেলে আসা এক ধুলোময়, শব্দময় শহর আর শহরতলীর পুজোর মণ্ডপ, বেগুনি পানাফুল, বৃষ্টিভরা টলটলে পুকুর, নীল আকাশ, আর পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া রুপোলি প্লেনের ছবি দেখতে থাকি। ■

পশ্চিম বঙ্গের, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পিংবনীর দুর্গা মন্দিরে, দেবী দুর্গার এই আলোকচিত্রটি গ্রহণ করেছেন শ্রী সৌমিক সেন (@soumik88)।

Courtesy: www.unsplash.com

সন্ধি

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

(১)

সন্ধি পূজা দর্শনের ইচ্ছাটা কেমন যেন প্রবল হয়ে উঠল এবার। তাই অনেক বছর পর, পাড়ার পূজামণ্ডপে এবার হাজির হোল অবিনাশ। ধূপ, ধুনা আর ফুলের গন্ধে সুবাসিত, সুসজ্জিত মণ্ডপ, আজও যেন তেমনি আছে যেমন ছিল বছর বিশেক আগে। শুধু একটু বদলে গেছে মণ্ডপের সাজসজ্জা আর আলোর ব্যবহার। এল ই ডি লাইট এর যুগ, টিউব লাইটরা নিয়েছে বিদায়। মণ্ডপের ভিতর ফ্যানের বদলে শোভা পাচ্ছে বেশ কয়েকটা বড় বড় কুলার।

কিছু বয়স্ক ভদ্রলোক ও মহিলারা আগে থেকেই সামনের চেয়ারগুল দখল করে বসে রয়েছেন, পিছনের চেয়ারগুলো বেশিরভাগি খালি। তবে সেখানে বাচ্চাদের রাজত্ব। কার ক্যাপের আওয়াজ কত বেশি এবং কার বন্দুকটা কত বড় তাই নিয়ে চলছে ওদের বিরামহীন, জোরালো বিতর্ক।

পূজাবেদিতে পুরোহিত মহাশয় তাঁর পূজার উপকরণ সাজিয়ে নিচ্ছেন। দু'একজন তাঁকে সাহায্য করতে ব্যস্ত। বাইরে বর্ষিত হচ্ছে অকালের অবিরাম বারিধারা। তাই আজ সকালে মণ্ডপে

লোক সমাগম কম। অবশ্য তা একদিক থেকে ভাল, কারণ এত বৃষ্টির মধ্যেও, কুলার চালিয়েও মণ্ডপের ভিতরে গরম কম নয়।

আজকাল ভিড়ভাট্টা বা উচ্চকিত শোরগোল, কোনটাই আর তেমন ভাল লাগে না। অল্প ঘাম এলেই মাথাটা কেমন ঘোরে, তাই সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সন্ধি পূজা দেখার ইচ্ছাটা ত্যাগ করে, পিছনে বসাটাই শ্রেয় মনে হোল। একটু পিছনেই একটা কুলারের সামনে, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল অবিনাশ।

দুটি চোখ বন্ধ করে সে মা দুর্গার সেই স্বর্ণময়ী, পীতবস্ত্রা রূপটি স্বরণ করার চেষ্টা করতে লাগল। কতটা সময় এভাবে কেটেছে কে জানে? হঠাৎ মনে হল চণ্ড ও মুণ্ড যেন পিছন থেকে এসে মা দুর্গাকে আক্রমণ করল। ক্রুদ্ধা মাতার তৃতীয় নয়ন যেন উন্মোচিত হল, তাঁর সেই নীলাভ অবয়ব থেকে যেন উদ্গতা হলেন দেবী চামুণ্ডা – শীর্ণা অস্থি-চর্মসার কলেবর; দীর্ঘ দন্তা; নীল পদ্মের ন্যায় গাত্র বর্ণ; হস্তে অস্ত্র, দণ্ড ও চন্দ্রহাস; পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। পূজাবেদি থেকে যেন ছুটে বেরিয়ে গেলেন পৃথিবীর সর্ব অঙ্গার দূরীকরণে উন্মত্তা এক নারীমূর্তি। ঠিক সেই মুহূর্তে অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণের আগমন বার্তা জ্ঞাপন করতে বেজে উঠল ঢাক।

(২)

চোখ খুলে অবিনাশ দেখল ভিড় বেশ বেড়েছে। একটি তরুণ আর একটি তরুণী কাছেই দু'টি চেয়ারে বসে

নিজেদের মধ্যে গল্পে মশগুল। অবিনাশের উপস্থিতি ওদেরকে বোধহয় নামমাত্রও উদ্বিগ্ন করছে না। যুগ পাল্টে গেছে। তরুণটি বলল – এইসব পূজা টুজা আমার একেবারে ধাতে সয়না। এক সুন্দর তির্যক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে, তরুণীটি জিজ্ঞাসা করল – তবে এলি কেন? তরুণের পাল্টা প্রশ্ন – তুই জানিস না? অতঃপর তরুণীর কটাক্ষ – মেয়ে দেখতে? তরুণ জানাল – শুধু একটা মেয়েকে দেখতে। সেটা হচ্ছিস তুই। উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে তরুণী সুর করে বলে উঠল – আ-হা-হা-হা...

ওদের কথোপকথন শুনতে শুনতে অবিনাশ যেন পৌঁছে গিয়েছিল প্রায় পঁচিশ বছর পিছনে। বেশ উপভোগ্য লাগছিল দুই আধুনিক তরুণ তরুণীর সংলাপ। তরুণটি বোধহয় ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বেকার, তরুণীটি স্নাতকোত্তর কোন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরিক্ষা দিতে চলেছে। অর্থাৎ দু'জনেই পায়ের নীচে শক্ত মাটি খুঁজছে। আবার তার সাথে সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্নেও বিভোর। অবিনাশের একবার মনে হোল ওদের সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন। মনে হোল ওদের বলে, স্বপ্ন দেখার আগে স্বনির্ভর হও। কিন্তু আবার মনে পড়ল – আমাদের দেশে স্বনির্ভর হবার পর আর স্বপ্ন দেখার সময় থাকে না...

যথা সময় ঢাকের বাদ্যি সন্ধি পূজার সমাপ্তি ঘোষণা করল। এবার প্রণামীদান ও প্রসাদ গ্রহণপূর্বক ঘরে ফেরার

পালা। সামনের চেয়ারে বসা লোকগুল এক এক করে প্রসাদ হাতে অবিনাশের পাশ দিয়েই বেরিয়ে যেতে লাগল। ওদের সবাই স্থানীয় ও পরিচিত হওয়ায় দু'এক জনের সাথে একটা দুট কথাও হোল।

ওই তরুণ তরুণী স্থান পরিবর্তন না করলেও, এত লোকের শোরগোলের মাঝে, ওদের কথা আর ভাল করে শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ ভীড়ের ভিতর থেকে এক শুভ্রবসনা নারী একটি বালকের হাত ধরে তার ইংরাজীতে শুধান (বালকের) উত্তর বাঙলায় দিতে দিতে এগিয়ে এল। অবিনাশ স্পষ্ট শুনতে পেল, ছেলেটা তার মাকে জিজ্ঞাসা করছে – মম ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট দ্য গড হ্যস হার্ড এভরিওয়ান'স প্লী? মা ছেলেটাকে বলল – দেবী দুর্গা সবাইকে জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার শক্তি দেন। ছেলেটা আবার প্রশ্ন রাখল – বাট, ইফ এভরিওয়ান ইস হার চাইল্ড, হোয়াই ডু দে নীড এক্সট্রা পাওয়ার টু উইন ইন দেয়ার স্ট্রাগলস? মা'র উত্তর – মানুষকে সংগ্রাম করেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হয়, এটাই জীবনের নিয়ম।

(৩)

সন্তানের হাত ধরে সেই নারী আরও একটু কাছে আসতেই চমকে উঠল অবিনাশ। প্রায় নিজের অজান্তেই, অস্ফুট স্বরে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা অদ্ভুত ডাক –

সাথী... এ কি বেশ তোমার? শুভ্র বসনা সাথী মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল – মোহ তো চিরদিন থাকেনা। একদিন না একদিন জীবনের সব রঙ মিলে গিয়ে সাদাইত হয়ে যায়, অবিনাশদা।

ইতিমধ্যে ছেলেটার প্রশ্ন আবার শুরু হোল। মম হু ইস দিস আঙ্কেল? ইস হি দ্যাট এঞ্জেল হু লিভস ইন ইন্ডিয়া? মা'র উত্তর – হ্যাঁ, সত্যিই এক এঞ্জেল। আমার অনেক পুরান বেস্ট ফ্রেণ্ড।

অবিনাশ কি বলবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। তবু কিছুত বলতে হয়ই। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে বলল – কি হয়েছিল প্রত্যুষের? সাথীর সংক্ষিপ্ত উত্তর – এইডস। বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যাথা মোচড় দিয়ে উঠল অবিনাশের। কাঁপা কাঁপা গলায় সে জিজ্ঞাসা করল – তবে কি তবে কি প্রত্যুষ তোমার সাথে থাকত না? ঠোঁট কামড়ে সাথী বলল – যেদিন বাইরের সঙ্গীনিরা ব্যস্ত থাকত সেদিন থাকত ঘরে। আমেরিকাতে অনেক ইন্ডিয়ান মেয়েরি এই অবস্থা। কেউ বলে, কেউ প্রকাশ করে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অবিনাশের। একবার মা'র মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে, ছেলেটা এবার তার দিকে এগিয়ে এসে তার হাতটা ধরে বলল – এঞ্জেল, হোয়েন উইল ইউ কাম টু আওয়ার হোম? এখানে আর বেশি কথা বাড়ালে যে একটা বাজে 'সিন ক্রিয়েট' হবে, অবিনাশ তা বেশ বুঝতে পারছিল। সম্ভবত ওই ছোট্ট ছেলেটাও সেটা অনুভব করতে পারছিল। নীরবতা ভেঙে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করল –

হোয়াট'স ইওর নেম? ছেলেটা বলল – আই এম পিকু। অবিনাশ বলল – ইফ আই কাম টু সি ইউ এট সেভেন পি এম টুডে, উইল দ্যট বি অলরাইট পিকু? পিকু মুখে একটা হাল্কা হাসির ঝলক এনে বলল – সিওরলি এঞ্জেল।

(৪)

সাথীর সাথে অবিনাশের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল স্কুলজীবন থেকেই। এ কথা সেসময় পাড়ার কারোরই অজানা ছিল না। সাথীর বাবা বঙ্কিম বাবুরও সেই অবাধ মেলামেশায় ছিল না কোন আপত্তি। মা-হারা মেয়েটা একটা ভাল ছেলের সাথে মিশছে, এতে আপত্তি জানানোর কী বা আছে? মনে মনে বঙ্কিম বাবু একটু কনফিডেন্টই বোধ করতেন – কারণ তিনি অবিনাশকে ভাল করেই জানতেন এবং এক প্রকার নিজের ছেলের মতই ভালবাসতেন।

কিন্তু শেয়ার মার্কেটের দালাল বঙ্কিম বাবুর স্বপ্নসমূহ চিরকালই অনেক ঊর্দ্ধাকাশে বিচরণ করত। তাই যখন তিনি এক ক্লায়েন্টের মাধ্যমে আমেরিকা প্রবাসী প্রত্যুষের সন্ধান পান, তখন এন. আর. আই. জামাই পাবার লোভ সম্বরণ করতে পারেননি। অবিনাশ তো তখন এক বেকার ইঞ্জিনিয়ার। যতই মেধাবী হোক না কেন – পকেট তো তার গড়ের মাঠ।

সাথী সহজে রাজী না হওয়ায়, নিজের আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে, বঙ্কিম বাবু তাকে ইমোশানালি ব্ল্যাকমেল করে

রাজী করিয়েছিলেন প্রত্যুষকে বিয়ে করতে। বাবার জোর জবরদস্তিতে সাথী নিজেই অবিনাশকে জানিয়ে দিয়েছিল – প্রেম করলেই বিয়ে করা যায়না। বিবাহিত জীবন চালানোর জন্য লাগে পয়সা। এ বাড়ীতে সে আর অবিনাশকে দেখতে চায়নি। দালাল বঙ্কিম বাবু কিন্তু ভাল মানুষটি সেজে বিয়ের যাবতীয় বাইরের ছোটাছুটির কাজ অবিনাশেরই ঘাড়ে তুলে দিয়েছিলেন।

(৫)

মানুষ যাই করুক না কেন, ওপর থেকে কেউ সবকিছুতেই নজর রাখেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে যে বিবাহিত জীবনে সুখী হয়নি, বঙ্কিম বাবু কিছুদিনের মধ্যেই তা জানতে পারেন। মনের দুঃখে সেই ধুরন্ধর দালাল মানুষটি একেবারেই কুঁকড়ে যান। নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কিংবা একান্ত ঠেকায় পরে একদিন তিনি অবিনাশকে ডেকে পাঠান। সেই সময়ে তাঁর ক্যান্সারের চিকিৎসা চলছে। পয়সার জোর থাকলে, অন্তত কিছুদিন মানুষের চিকিৎসা এবং দেখাশোনার অভাব হয়না। বঙ্কিম বাবুর সে জোর যথেষ্টই ছিল, তাই তাঁর চিকিৎসা এবং দেখাশোনা কোনটারই কোনরকম খামতি ছিলনা। কিন্তু হায়রে কপাল, এই পৃথিবীতে মুষড়ে পড়া মনের যে কোনই চিকিৎসক আজও জন্ম নেয়নি।

অবিনাশ এলে, বঙ্কিম বাবু নিজের দুর্বুদ্ধির সব কথা তার কাছে অকপটে স্বীকার করেন, এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। প্রত্যুষের দুশ্চরিত্র এবং দুষ্কর্মের কিছু কিছু কথা যা তিনি লোকমুখে জানতে পেরেছিলেন, সেই সময় সে সবও তাকে খুলে বলেন।

অবিনাশ এই মৃত্যুপথ যাত্রীর চিকিৎসার সমস্ত তদারকি স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত অবিনাশ নিজের ছেলের মতই বঙ্কিম বাবুর দেখাশোনা করেছিল। তাঁর ইচ্ছাতেই তাঁর অন্তিম ক্রিয়াকর্মও সম্পন্ন হয়েছিল অবিনাশের হাতে।

অবিনাশকে বুঝিয়ে, বঙ্কিম বাবু তাঁর অট্টালিকার পাওয়ার অব অ্যাটর্নি টা তার হাতেই তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন এই আশা নিয়ে – যে যদি কোনদিন সাথী ফিরে আসে, সে অন্তত বাস্তুহারা হবেনা।

বঙ্কিম বাবুর অন্তিম কালে সাথী আসতে পারেনি, মানে তাকে আসতে দেওয়া হয়নি। আমেরিকাতে নিয়ে গিয়েই প্রত্যুষ সাথীর পাসপোর্ট ও ভিসা লুকিয়ে রাখে, যাতে সে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনরকম পদক্ষেপ না নিতে পারে। বঙ্কিম বাবু জেনেই গিয়েছিলেন যে সাথীকে প্রত্যুষ কোনদিনই স্ত্রীর মর্যাদা দিতনা, তার ঘরে চাকরানীর মত পরে থাকত সাথী। আর মার খেত কথায় কথায়। কিন্তু কি অদ্ভুত, বিয়ের পরে যা তিন চারটে চিঠি সাথী পাঠাতে পেরেছিল আমেরিকা থেকে, তার একটাতেও সে কিন্তু

তার দুর্ভাগ্যের কথা জানায়নি বাবাকে। একবার একটা রেফারেন্স পেলেও, বঙ্কিম বাবু ডোমেস্টিক ভাওলেন্সের চার্জ আনতে পারতেন প্রত্যুষের বিরুদ্ধে। ও দেশে সেটা যে এক মস্ত অপরাধ। হায়রে ভারতীয় নারী, শুধু বাবার মনে কষ্ট দেবনা বলে সারাজীবন নিজেই কষ্ট করে গেলি, কিন্তু কি লাভটা হোল?

(৬)

নিজের হাতে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি থাকা সত্ত্বেও, বঙ্কিম বাবুর দেহান্তের পর থেকে অবিনাশ আজ পর্যন্ত সাথীদের বাড়িতে ঢোকেনি। তাঁর বাৎসরিক কাজগুলোও সে গঙ্গার তীরেই সেরে নেয়। সাথীর বিবাহের ঠিক পরেই অবিনাশ নিজের ফ্যাক্টরি খুলে, কিছু অর্ডার সাপ্লাইএর কাজ শুরু করেছিল। ঈশ্বরের আশীর্বাদে আজ তার আমদানি ভালই, তার ওপর সে এক নেশাহীন, অকৃতদার। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক থেকে আজ সে এ পাড়ার একজন নাম করা উচ্চবিত্ত। নিজের ফ্যাক্টরি-অফিসের একজন স্টাফকে সে পারমানেন্টলি লাগিয়ে রেখেছে এই বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। বঙ্কিম বাবুর গচ্ছিত সম্পত্তি সাথীর হাতে তুলে দিতে পারলেই যেন তার পরম শান্তি। সাথীর আসার সংবাদ সে বাড়ীতে রাখা কেয়ারটেকার বিষ্ণুর মাধ্যমেই পেয়েছিল। কিন্তু কিভাবে তার সামনে হাজির হবে তা ঠিক করে উঠতে পারছিল না। যা হোক আজ মা চামুণ্ডাই একটা রাস্তা করে দিয়েছেন। পিকুর আহ্বানত আছেই।

বার্তা

ঠিক সন্ধ্যা সাতটার সময় সাথীদের বিশাল বাড়ীর সামনে হাজির হোল অবিনাশ। পিকু জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল। দেখতে পেয়ে ছুটে এসে দরজা খুলে, তাকে হাত ধরে ওপরে নিয়ে এল। বিশাল ড্রইংরুমের এক কোণায় ডাইনিং টেবিল, তারই ওপর কনুইগুল রেখে দুই হাতের তালুতে মুখ গুঁজে চেয়ারে বসে আছে সাথী। পিকু অবিনাশের হাত ছেড়ে আর একটা চেয়ার টেনে ডাইনিং টেবিলেই সেট করে দিল, তারপর বলল – প্লিস টেক ইয়োর সিট আঙ্কেল। অবিনাশকে বসিয়েই পিকু ছুটে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

এক ঘর ভরা নীরবতার মাঝে, বিশাল ডাইনিং টেবিলের দুই ধারে অবিনাশ আর সাথী – একে অপরের চোখে চোখ রেখে বসে আছে। মুখে নেই কোন ভাষা। অথচ তিরিশ বছর আগে এই টেবল কেঁপে উঠত ওদের চীৎকারে আর হাসিতে। তবে কি সত্যিই সময় মানুষকে নীরবতা শেখায়?

বেশ কিছুক্ষণ পরে নীরবতা ভেঙে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করল – ক’দিনের ছুটি? সাথীর জবাব – চিরদিনের... বিস্মিত অবিনাশ প্রশ্ন করল – মানে? সাথী বলল – আর ফিরব না।

একটু চিন্তা করে অবিনাশ বলল – কিন্তু পিকু কি এই দেশের এই পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারবে? সাথীর সংক্ষিপ্ত উত্তর – ও ইন্ডিয়া কে ভালবাসে। অবিনাশ জিজ্ঞাসা করে – আর তুমি, এতকাল ওখানে থাকার পর...

তার কথা কেটে দিয়ে সাথী বলে – আমি তো ওদেশে যেতে চাইনি একবারও।

অবিনাশ জানতে চাইল – পিকুর বয়স কত? সাথী বলল – সাত চলছে, ওকে স্কুলে ভর্তি করতে হবে। আমার কাছে কোন পেপার নেই, আর ওর বাবার নামও আমি বদলাতে চাই। অবিনাশ বলল – পিকু কি আমায় মেনে নেবে? সাথীর উত্তর – ও তোমার আমার সব কথাই জানে। আর এটাও জানে যে এখন থেকে তুমিই আমাদের গার্জেন। বাকীটা তোমার ওপর...

অবিনাশ কিছু বলার আগেই, হঠাৎ কোথার থেকে ড্রেস-আপ করে, পিকু ছুটে এল। এসেই সাথীকে বলল – ও মম, ইউ আর নট ইয়েট রেডি! প্লিস হ্যারী আপ। তারপর অবিনাশকে জড়িয়ে ধরে বলল – আঞ্জেল, ওন্ট ইউ টেক আস টু শো দ্য দুর্গা পূজা ফেস্টিভাল ইন ক্যালকাটা? নিজের অজান্তেই অবিনাশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল – সিওরলি, মাই চাইল্ড। আই উইল ডু মাই বেস্ট ফর ইউ... ■

বার্তাঃ “সন্ধি” গল্পটা কিছু সত্যি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। ভারত ও বাংলাদেশের বেশ কিছু অভিভাবক এন. আর. আই. / বি. পাত্রের হাতে মেয়েদের তুলে দিতে বেশ গর্ববোধ করেন। কিন্তু যেমন চকচক করলেই সব বস্তু সোনা হয়না, তেমনই সব এন. আর. আই. / বি. পাত্রই ভাল হয়না। মেয়েদের নিজের জোরে বিদেশ যাবার জন্য উপযুক্ত করে তুলুন। বিবাহ সূত্রে তাদের বিদেশে পাঠানোর ফল সব সময় ভাল হয় না। ■
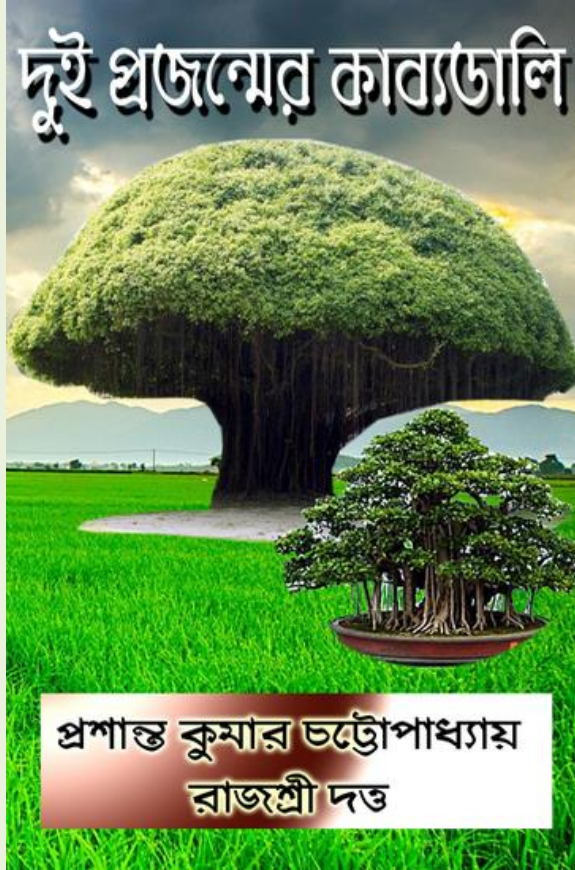
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

প্রাপ্তিস্থলঃ 1) www.flipkart.com

(Search Words: dui-projonmer-kabyadali)

2) E-mail: contactpandulipi@gmail.com

পুজোর গন্ধ তখন–এখন

প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য

অফিস থেকে বাড়িতে হাতমুখ ধুয়ে এককাপ চা নিয়ে বসে টিভিটা চালালাম। প্রথমেই একটা নিউজ ক্লিপিংস নজরে পড়ল "পুজোর বাকি ৫০ দিন।" মনটা বিরক্তিতে ভরে গ্যালো। অফিসেও টিফিন খেতে খেতে খবরের কাগজটাতে চোখ বোলাতে গিয়ে একটা বিজ্ঞাপন নজরে পড়ে "পুজোয় বিশেষ ছাড়।" পুজোটা যে আসছে সেটা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে বহুজাতিক সংস্থা।

পুজো আসছে মনে হলেই আশৈশব একটা অন্য ধরণের আনন্দে বুকের ভেতরটা ছলকে উঠত। কিন্তু না টি. ভি. কিংবা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে সেই আনন্দ পাই না। পাই না যে তার কারণ এই পুজো কর্পোরেট পুজো। যা আনন্দের কারণ হয় না। আমাদের ছাত্রাবস্থায় পুজোর আনন্দ ছিল অন্যরকম। সারা বছর স্থানীয় শিশু-বালক-বালিকা-কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে মিশে কাজ করি। অনেকটা এলাকাজুড়ে এই বয়সীদের মনের খবর জানি। সেই জানা থেকেই বুঝতে পারি বর্তমানের শিশু-বালক-বালিকা-কিশোর-কিশোরীদের আনন্দ-পছন্দকেও নিয়ন্ত্রিত

করে কর্পোরেট দুনিয়া। তাদের আনন্দের উপকরণগুলি তাই হয়ে উঠেছে সম্পদভিত্তিক। আজকের বালক জানে কোন লজেন্সের সঙ্গে বা কোন চিপসের প্যাকেটের সঙ্গে কি ফ্রি দেওয়া হচ্ছে। আজকের বালক-বালিকা-কিশোর-কিশোরী বোঝে স্থানীয় দোকানে থাকে "লোকাল মাল" শপিংমলে "ব্র্যান্ডেড মাল" পাওয়া যায়। কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন এতে ক্ষতি কী? ক্ষতি সুকুমার মনের। কারণ কর্পোরেট দুনিয়া সুকুমার মন চায় না – চায় কাস্টমার মন।

পনেরই আগস্টের দিন টিভিতে দেখলাম পুজোর বাকী ৫০ দিন। আমার বেশ মনে পড়ে, একবার কিশোর বয়সে পনেরই অগাস্টের দিন আমার ভাই বলেছিল, "পুজো এসে গ্যালো।" মা অমনি ধমক দিয়ে বলেছিল, "এখন থেকেই পুজো পুজো করে পড়াশুনা লাটে উঠলো নাকি?"

মহালয়ার দু'একদিন পরেই স্কুলে পূজোর ছুটি পড়ত। আমাদের সঙ্গে বইয়ের সম্পর্কেরও ছুটি। সেই অভ্যাসেই অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী বড় হয়েছে। জীবনে প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে। চাকরী জীবনে জাপান-আমেরিকাতেও গেছে। গত বছর পুজোর ষষ্টির দিনও আমি এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ঊনিশ জনকে দেখেছি প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়তে যাচ্ছে। কেন হল এমন? বহুজাতিক-কর্পোরেট শাসিত বোকাবাক্স পরিচালিত আমাদের বর্তমান জীবনচর্চা ও চর্যা বিশ্বকাপ ফুটবলকে যেমন ঘরের মধ্যে এনে দিয়েছে

তেমন শুষে নিয়েছে অনেক কিছু – অনেক সুকুমার বোধ। যার ফলশ্রুতি অসংখ্য অপরিণত বয়সের কিশোর-কিশোরীর সামান্য কারণে আত্মহত্যা।

ছাত্র জীবনে পুজো আসত আমাদের কাছে প্রথমে ধীর গতিতে। পনেরোই অগাস্টের দিন থেকেই টের পেতাম পুজো আসছে। স্থানীয় এলাকায় বেশ খানিকটা দূরে দূরে পাঁচ-ছটা পুজো হত। তার মধ্যে চারটে পুজোর ঠাকুর সেখানেই তৈরী হত। একটা মঠে, একটা চ্যাটার্জী বাড়িতে, একটা লাইব্রেরির সামনের জায়গায়, আর একটা নবনারী মন্দিরে। নবনারী মন্দির দুটো। পুরাতন নবনারী ও নতুন নবনারী। পুরাতন নবনারীতে ঠাকুর তৈরী হত। নতুন নবনারীতে ঠাকুর আসত কুমারটুলি থেকে। একটু একটু করে খড়ের কাঠামো বাঁধা থেকে শুরু করে কাঠামোয় মাটি ধরানো – ধীরে ধীরে প্রতিমা যেন জীবন্ত হয়ে উঠত।

স্কুল ছুটি হত বিকাল চারটের সময়। স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথের উলটো দিকে হেঁটে গিয়ে কিছুক্ষণ দেখতাম ঠাকুর কতটা হয়েছে। আগের দিন যা দেখেছিলাম তারপর কতটা এগিয়েছে। পাড়ার বড়রা দেখতে পেলে ধমক দিয়ে বলত, “এই স্কুল থেকে বাড়ি যাসনি কেন? যা বাড়ি যা।” তারা তো বুঝত না ঠাকুরটা কতটা হয়েছে সেটা দেখা ওই বয়সের একটা কিশোরের কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যারা ঠাকুর বানাত তাদের কাছে কত রকমের প্রশ্ন

করতাম। প্রায়ই বলতাম একটা পুতুল বানিয়ে দিতে। মাটি দিয়ে তারা পুতুল বানিয়ে দিত, বোনকে এনে দিতাম। কিভাবে আমার চোখের সামনে পুতুলটা বানালো তার বর্ণনা করতাম। সবচেয়ে মজার ছিল পুজো কেটে যাবার পরে ওই প্রতিদিনের দেখে আসা অভিজ্ঞতা থেকে মাটি দিয়ে ঠাকুর তৈরী করতাম। মায়ের কাছে বাতাসা চেয়ে নিয়ে পুজোও করেছি এবং পাশের পুকুরে ঠাকুর বিসর্জনও দিয়েছি। সবই করেছি একদম নিয়ম মাফিক – নিখুঁত – বড়দের দেখে।

আকাশে বাতাসে যেমন একটা পুজো পুজো ভাব থাকত – যেন একটা পুজোর গন্ধ ক্রমশ তীব্র হত। বিশ্বকর্মার পুজোর দিন থেকে বেশি করে টের পাওয়া যেত। আগের দিন মা অনেক জামাকাপড় কাচাকাচি করত। পুরোনো বাসন কাঁসা পেতলের – ঠাকুরের বাসন তেঁতুল দিয়ে মাজত।

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সমস্ত জামাকাপড় বিছানার তোষক বালিশ সব রোদ্দুরে দেওয়া হত। আর ছিল ঘুড়ি ওড়ানো দেখা দু'তিন দিন আগে পাড়ার দাদারা ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দিত। খেলার মাঠের গোল পোষ্টে বা রাস্তার ধারের একটা লাইট পোষ্ট থেকে আর একটা পোষ্ট পর্যন্ত ঘুড়ির সুতো পাক দিয়ে রেখে মাঞ্জা দিত। মাঞ্জা তৈরীটাও দেখার জিনিস। সাবুর সঙ্গে কাচের গুঁড়ো মিশিয়ে মাঞ্জা তৈরী হত। একটা ছোট কাপড়ের টুকরো জলে ভিজিয়ে দু আঙুলে

চেপে ধরে সুতোর একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হত। একে বলে টিপনি দেওয়া। দাদারা মাঞ্জা দিত সব সময় কাছে থাকতাম কোনটা কি করতে বলে। উদ্দেশ্য একটাই আমাকে একটা ঘুড়ি দেবে আর একটুখানি সুতোও দেবে। মাঞ্জা দিতে অনেক সময় লাগত। রোদ্দুরে মাঞ্জা দেওয়া হত তারপর শুকিয়ে গেলে সুতোটা লাটাইতে গুটানো হত। বিকালে যখন ঘুড়ি ওড়াত তখন আমাকে বলত, “তল্লাই দে” আমি ঘুড়িটার দুপাশটা ধরে অনেকটা দূরে চলে যেতাম, তারপর দুহাতে ধরে ওপর দিকে তুলে দিতাম আর সেই দাদারা বাঁ হাতে লাটাই ধরে ডান হাতে সুতোয় টান দিয়ে দিয়ে ঘুড়িটা আকাশে অনেক উঁচুতে তুলত। ঘুড়িতে ঘুড়িতে প্যাঁচ লাগানোর খেলা চলত। যে ঘুড়িটা কেটে যেত সেটা হেলে দুলে বাতাসে ভাসতে ভাসতে অনেকখানি গিয়ে, তারপর কারোর বাড়ির ছাদে পড়ত বা কোন গাছের ডালে আটকাত। ঘুড়ির সুতোটা যে প্রথম ধরতে পারবে ঘুড়িটা তার। কেটে যাওয়া ঘুড়ি ধরার একটা আলাদা আনন্দ ছিল। একসঙ্গে পাঁচ-ছ’জন দৌড়াত ঘুড়িটাকে ধরার জন্য।

শিবু খুব দুরন্ত ছিল। ঘুড়ি ধরার জন্য যে কোন পাঁচিল বা ছাদের কার্নিশ বেয়ে উঠে যেত। উঠতে পারত যেকোন গাছের ডালে। বড়রা বকত। বকার কারণ ছেলেটা পড়ে গিয়ে হাত-পা না ভাঙে। তখন পাড়ার যে কোন বড় যে

কোন ছোট ছেলেকে বকতে পারত। এখন পারে না। ঘুড়ির জন্য বাড়িতে বকুনি খায়নি এরকম ছেলে ছিলনা বললেই হয়। কিন্তু বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ছাড় ছিল। ওই দিন আর একটা ব্যাপার ছিল – সব বাড়িতেই আগের দিন ভাত ও নানারকম আনাজ ভাজা করে রাখত, আর চালতা দিয়ে ডাল আর ইলিশ মাছ ভাজা। একে বলা হয় রান্না পুজো।

পাড়ার যে কোন বাড়িতে খেতাম সেদিন। আমরা পূর্ববঙ্গীয় ছিলাম বলে আমাদের বাড়িতে রান্না পুজো হত না। বিশ্বকর্মা পূজোর পরের দিন একটা বড় ঠেলা গাড়িতে করে অনেক লম্বা লম্বা বাঁশ এসে পড়ত ক্লাবের পাশের মাঠে। সেটা দেখেই বুকের মধ্যে একটা আনন্দের ঢেউ। প্যাণ্ডেল হবে। ঠাকুরের প্যাণ্ডেল। প্যাণ্ডেলের বাঁশ পড়ার পর থেকে লক্ষ্মী পুজো পর্যন্ত জায়গাটার নামই হয়ে যেত ঠাকুরতলা। রবিবার দিন ক্লাবের বড়রা আমাদের বাড়ি আসতো বাবার কাছে। চাঁদা নিত – চা খেত। একটা যেন আত্মীয়তা। কোন বিরোধ নয়। চাঁদা নিয়ে চলে যাবার সময় মাকে বলে যেত "বৌদি আসবেন।" মা বলত, "নিশ্চয়ই যাবো।" আবার মা জিজ্ঞেস করত, "এই সন্ধি পুজোটা কটার সময় পড়েছে গো?" কেউ একজন বলত "এবারে সন্ধি পুজো একটু বেশী রাতে পড়েছে – রাত একটা।"

প্যাণ্ডেলের বাঁশ বাঁধা হয়ে গেলেই আমাদের সারা দিনের জায়গা হত সেখানে। প্যাণ্ডেলের বাঁশে দোল খাওয়া

নেই সেই...

প্যাণ্ডেলের চত্বরের মধ্যে গুলি খেলা। পাশেই একতলা ক্লাবঘর। সেখানে বড়রা নানা রকম হিসাব করত আলোচনা করত পুজোর। মাঝে মাঝে তাদের কেউ একজন আমাদের কাউকে ডেকে বলত একটু দূরের দোকান থেকে তার নাম করে সিগারেট বা বিড়ি নিয়ে আসতে। বিড়ির একটা মজা ছিল। কেউ বলত "অধিকারীর সাদা সুতো বিড়ি," কেউ বলত "জয়হিন্দ বিড়ি।" আর যে ছেলেটাকে আনতে দিত বিড়ি বা সিগারেট নগদ পয়সা দিয়ে দিলে বলত – তুই একটা লজেন্স নিবি। তা না হলে দোকানদারকে বলতে বলত – দোকানদারও জানত যে আনতে যাবে তার একটা পাওনা হয়।

ঐ সময়টা লজেন্স না নিয়ে গুলি কিনতাম। পাঁচ পয়সায় দশটা গুলি। এই গুলি খেলা হত দু'ভাবে। একহাতের দুই আঙুলে গুলি ধরে আর এক হাতের আঙুলের ডগায় ঠেকিয়ে প্রায় গুলতির পদ্ধতিতেই অপরের গুলিকে তাক করে মারা। আর এক প্রকার হল ধামপিল। প্রত্যেকে সমান সংখ্যক গুলি দিত। মাটিতে একটা সরু কিছু দিয়ে একটা বর্গাকার ক্ষেত্র আঁকা হত। সব গুলিগুলো সেখানে ছড়িয়ে দিয়েএকটু দূর থেকে একটা গুলি দিয়ে টিপ করে মারতে হত – যার টিপ যত ভালো সে বেশী গুলি জিতে নিয়ে বাড়ি যেত। প্রত্যেকটা ছেলের বাড়িতেই গুলিখেলা নিয়ে বাবা-মায়ের বকুনি খেতে হত। কিন্তু দেখা যেত ছেলেটা হয়ত ঘুমিয়ে

পড়েছে কিংবা স্কুলে গেছে তার গুলি এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। মা তখন সেই গুলি তুলে যত্ন করে রেখে দিত।

এখনকার মতো তখনকার দিনে ছেলেদের জামা প্যান্ট অত বেশি ছিল না। সব সময় যে সেটা অর্থাভাবের কারণে তাও নয়। অভিভাবকরা বিশেষত বাবারা বেশি জামা-প্যান্ট কেনা অপ্রয়োজনীয় মনে করতেন। তার ওপর কি জামা-প্যান্ট কেনা হবে সেই বিষয়ে ছেলেদের রুচি পছন্দের কোন গুরুত্ব বাবার কাছে ছিলনা। ফলে যখন নতুন জামা প্যান্ট কেনা হত তার কদরও আদর দুটোই ছেলেদের কাছে ছিল প্রবল। পুজোর সময় কেনা জামা-প্যান্টে দোকানের যে ট্যাগ থাকত, সেটাও ছিঁড়তাম না। লোকে যেন বুঝতে পারে আমি নতুন জামা-প্যান্ট পড়েছি।

এই কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ে গ্যালো। এক বছর পুজোর দু'তিন দিন আগে আমাদেরই এক বন্ধু বাবুয়া মুখ ভারী করে আছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ওর পুজোর জামা প্যান্ট হয়েছে ঠিকই কিন্তু পুজোর মধ্যে সেগুলো পড়তে পারবে না। ওর এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠা মারা গ্যাছে বলে খবর এসেছে। ওদের অশৌচ। অশৌচ-এর মধ্যে নতুন জামা পড়া যায় না। ও ষষ্ঠীর দিন সকালে এসে আমার মাকে বলে আমাকে ডেকে নিয়ে গ্যালো ওদের বাড়িতে – ওর মা ডেকেছে কি একটা দরকার। গেলাম।

ওর মা আমাকে ওর নতুন জামা প্যান্টগুলো পরতে দিল। আমি একবার পরে আবার খুলে দিলাম। এবারে ও নতুন জামা প্যান্ট পরে ঠাকুর দেখতে পারবে। আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। মাকে এসে বললাম। মা বুঝিয়ে দিল। আমি একবার পরার ফলে নতুন জামা প্যান্টগুলো পুরোনো হয়ে গ্যালো বাবুয়ার কাছে। ফলে অশৌচের বাধা আর থাকল না। আমার শুধু ওইটুকু ভূমিকার জন্য বাবুয়া পূজোয় নতুন জামা প্যান্ট পরতে পেরেছে, এর জন্য ওর কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। আজকের কোন কিশোর এই গভীরতা বুঝবে না। পুজোয় একটা নতুন জামা পড়তে না পারার দুঃখ বা পড়তে পারার আনন্দ আজকের কিশোরদের তত ভাবিত করে না।

স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটির পর হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা হতো। সেই পরীক্ষার ফল বেরত পুজোর কিছু আগে। প্রত্যেকটা ছেলের ভয় ছিল হাফ ইয়ারলিতে ফেল করলে পুজোয় নতুন জামা বাবা কিনে দেবে না। অথচ হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা যাতে ভালো হয় তার জন্য গ্রীষ্মের ছুটিতে দু'একজন ছাড়া কেউই ভালো করে পড়ত না। এটা ছিল গড় ছাত্রদের স্বভাব। স্কুল-এর নিয়ম ছিল হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার রেজাল্ট দেবার তিন দিনের মধ্যেই সেই রেজাল্ট বাবাকে দিয়ে সই করিয়ে স্কুলে জমা দিতে হবে। রেজাল্ট খারাপ হয়েছে, সেটা বাবা জানতে পারলে আর নতুন জামা হবে না। তাই

নেই সেই...

অধিকাংশ ফেল করা ছাত্রই রেজাল্টে স্কুল যে নম্বর দিয়েছে তার আগে বা পরে তার নিজের মেধা অনুযায়ী একটা সংখা বসিয়ে বাবাকে দেখাত। কিন্তু সেই রেজাল্ট স্কুলে জমা দিত না। বার্ষিক বা এন্যুয়াল পরীক্ষার সময় রেজাল্ট হারিয়ে গেছে বলে পঞ্চাশ পয়সা ফাইন দিয়ে দিত।

একবার একটা মজা হয়েছিল। তখন ক্লাশ এইট। আমাদের এক বন্ধু সমস্ত বিষয়েই খুব কম নম্বর পেয়েছে। ও খুব ধনী ঘরের ছেলে। সেই সময় রেজাল্ট লেখা হত বাংলায়। খুবই সাধারণ ভাবে। এখনকার মতো ডিজিটাল সিস্টেমে নয়। তাই সহজেই রেজাল্টে লেখা প্রাপ্ত নম্বরের আগে বা পরে কোন একটি সংখ্যা বসিয়ে তাকে পালটে ফেলা সম্ভব ছিল। তো আমার সেই বন্ধু হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় সব বিষয়েই খুব কম নম্বর পেয়েছে। এমনকি মোট দশ নম্বর কোন বিষয়ে পায়নি এবং রেজাল্টে চাতুরি করার পক্ষে সেটা অনেক সুবিধা জনক। আমার হাতের লেখা খুব ভালো বলে – আমাকে গোপনে বলে রেজাল্টে নম্বর বাড়িয়ে দিতে। শর্ত ছিল দোকানে বসিয়ে আলুর দম পাউরুটি খাওয়াবে। তখনও এগরোল চাউমিন বাজারে আসেনি। নামই জানতাম না। ডিমের ওমলেটকে আমরা বলতাম মামলেট। তো আমি রেজাল্টে নম্বর বাড়িয়ে দিয়েছি এবং সেটাও দুজনে অনেক আলোচনা করে – যেন তার মেধা অনুযায়ী পাশ নম্বর হয়, বাবার কাছে ধরা না পড়ে।

নেই সেই...

অনেক হিসাব করে লিখতে হলো – যেমন ইংরাজীতে চার পেয়েছিল তার আগে একটা তিন লিখে দিলাম চৌত্রিশ হয়ে গেল। অপরিণত বয়সে অপরাধমূলক চালাকি করতে গেলে যা হয় আরকি। সংস্কৃতে দুই পেয়েছিল তো সে আমাকে বলল সংস্কৃত বাবা কিছু বোঝেনা একটু বাড়িয়ে দে, আমি আগে পাঁচ লিখে বাহান্ন করে দিলাম। সে সেই রেজাল্ট বাড়িতে দেখালো ওর বাবা রেজাল্ট দেখে বলল, থাক পরে সই করে দেব। ও বোঝেনি বিপদের সূচনা হল। আমাদের স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন যাঁদের বাড়ী সেই এলাকাতেই এবং অনেক ছাত্রের বাবার বন্ধু। শিক্ষকদের প্রতি অভিভাবকদের আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিলো। ফলে কোন শিক্ষক ভুল করে কোন ছাত্রকে শাস্তি দিলে বা মারলে সেই ছাত্র বাড়ীতে জানাতে পারত না – কারণ বাড়ির বিশ্বাস ছেলে নিশ্চয়ই অন্যায় করেছে তাই মাষ্টার মেরেছে। তো সেই বন্ধুর বাবা পরের দিন রেজাল্ট নিয়ে স্কুলে আসেন এবং তাঁর বন্ধু হন এমন একজন শিক্ষককে ডেকে অভিযোগ করেন রেজাল্টে যে নম্বর লেখা আছে তত বেশি নম্বর পাওয়ার যোগ্য তাঁর ছেলে নয়। শিক্ষকরা খাতা দেখতে সতর্ক হননি অথবা ছেলেটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। সেই শিক্ষক বুঝেছিলেন আসল ঘটনা ঠিক কি। পুজোর জামা এমনই এক বিষয় ছিল আমাদের কাছে।

নেই সেই...

তখন খবরের কাগজ আর রেডিও ছিল সংবাদ এবং বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম। প্রতি রবিবার সকালে রেডিওতে শিশুমহল। একটু বড় হয়ে শুনেছি অনুরোধের আসর যেটা পুরোটাই ছিল মা ও দিদিদের দখলে। মোহনবাগান – ইস্টবেঙ্গলের খেলার রিলে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয়। পূজোর সময় এই রেডিওর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। পাড়ার বাদল কাকার বাজারে একটি রেডিওর দোকান ছিল। সারা বছর দেখেছি লোকে তার কাছে রেডিও কিনতে যেত না, যেত রেডিও সারাতে। মহালয়ার এক সপ্তাহ আগে থেকে বাদলকাকার দোকানে ভিড়। কারণ মহালয়া শোনার জন্য রেডিও সারাতে হবে। বড়দের কাছে, বিশেষ করে বাড়ির প্রধান পুরুষদের কাছে, দেখেছি রেডিওর গুরুত্ব খবর শোনা আর ভোটের ফল জানা। তো মহালয়ার দিন ভোরবেলায় মহালয়া শুরু হলেই উঠে পড়তাম। তখন মহালয়ার ভোরে বেশ একটা ঠাণ্ডা ভাব থাকতো। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের (ছোটবেলায় নাম জানতাম না বড় হয়ে জেনেছি) চণ্ডীপাঠ কিচ্ছু বুঝতাম না, কিন্তু অদ্ভুত একটা ভালো-লাগা একটা পবিত্রভাব ঐ বয়সেও আমার কিশোর সত্ত্বাকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখত। অবশ্য মহালয়া শোনার নেশা এখনও আছে। প্রবলভাবে ঈশ্বর-অবিশ্বাসী এবং বস্তুবাদী হওয়া সত্ত্বেও আজও মনে হয় মহালয়ার সকালে রেডিওতে মহালয়ার ঐ চণ্ডীপাঠ যেন প্রাণের সঙ্গে, ব্যক্তি

সত্ত্বার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে – যেন আমার-দেশ আমার যাপন-আমার সব।

তখনকার দিনে স্কুলে পড়া কোন ছাত্র-ছাত্রী চা খেত না। রাতে মা বেশি করে রুটি করে রাখত সকালে সেই রুটি দিয়েই জল-খাবার খেতাম। মহালয়া শেষ হলেই ছুটতাম সেই প্যাণ্ডেলের দিকে, যেখানে ঠাকুর তৈরী হচ্ছে। সিংহের চোখে গুলি বসানো হবে। সে যেন এক আবিস্কারের আনন্দ। (বাকসাড়া) বাজারে ঠাকুরদাস পালের গোলা আছে, সেখানে ঠাকুর তৈরী হয়। মাঝে মাঝেই সেখানে ছুটে যেতাম। আশ্চর্য হয়ে দেখতাম কত ঠাকুর। ঠাসা ঠাসি করে রাখা। পরপর রাখা আছে শুধুই দুর্গা। আর এক জায়গায় পরপর অনেকগুলো লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ। দুর্গা ঠাকুরগুলোর কয়েকটার হাতে সুতোয় বাঁধা একটা কাগজে যারা ঠাকুর বায়না করে গেছে তাদের ক্লাবের নাম। আবার অনেকগুলো ঠাকুর একই সঙ্গে দুর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ পিছনে একটা বড় কুলোর মত। ওটাকে বলে একচালা ঠাকুর।

আমি খুব অবাক হয়ে ভাবতাম যেগুলো আলাদা আলাদা সেগুলো কোন দুর্গার সঙ্গে কোন লক্ষ্মী-গণেশ কি করে বুঝবে কোন চিহ্নও তো দেওয়া নেই। আজকে এ সব ভাবনা অবান্তর, কিন্তু সেই বয়সে, তখন পৃথিবীর সব কিছু নতুন করে আমার চোখের সামনে ধরা দিচ্ছে, সব বিস্ময় - সব আনন্দ আমার কাছে নতুন আবিষ্কারের রূপ নিয়ে ধরা দিচ্ছে। তখন পুজোর

কোন বিজ্ঞাপন ছিল না। কয়েকটা পণ্য পুজো উপলক্ষে বিজ্ঞাপন দিত। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাটা কোম্পানীর বিজ্ঞাপনঃ "পুজোয় চাই নতুন জুতো," মারফি রেডিওর বিজ্ঞাপন। অবশ্য রেডিওতে বোরোলিন, ভিক্স ভেপোরাব আর স্যারিডন ট্যাবলেটের বিজ্ঞাপন চলত। সেই বিজ্ঞাপনের কথা ও সুর এখনো মনে আছে। "সুরভিত এন্টিসেপটিক ক্রীম বোরোলীন..." আর "মাথা ধরায় দেয় আরাম, ব্যাথা বেদনায় হয় উপশম, একটি শুধু একটি – একটি স্যারিডন।" কি মধুর ছিল সে সব। বোধ হয় এই কারণেই "আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম..." গানটি গাওয়া হয়েছিল। ■

দুর্গা পূজা মণ্ডপে ঢাক বাজান...

Image Courtesy: অর্ণব দত্ত

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dhak_2010_Arnab_Dutta.JPG

মায়ের স্বরূপ

অসিত চট্টোপাধ্যায়

আমার মা ছিলেন কড়া ধাতের মানুষ। মায়ের দাপটে বাড়ির কাজের লোক থেকে ছেলে বউয়েরা সকলে তটস্থ থাকত। বরং বাবা ছিলেন নরম সরম মানুষ। বাবা চলে গেলেন। এই নরম সরম জীবন সঙ্গীটি চলে যাবার পর অদ্ভুত রকম ভাবে উধাও হয়ে গেল মায়ের দাপট। কোথায় সেই দাপটে মানুষ! একেবারে আমাদের অদেখা অচেনা কোমল স্বভাবের মা। আমার স্ত্রীর ওপর অসম্ভব নির্ভরশীল। একটা কাজ করেনা আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস না করে। কাউকে দশ বিশ টাকা দিতে হলেও আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে দেবে।

মায়ের খাওয়ার পরিমান ছিল খুব কম। ঠিক যেন পাখির আহার। কিন্তু সারাদিন টুকটাক এটা সেটা মুখ চলত মায়ের। আমাদের বাড়িতে একটা বহু পুরনো কাচের আলমারিতে নানা কৌটো বা শিশিতে রাখা থাকত কাটিভাজা, বাদাম, চানাচুর, পাটালি ইত্যাদি।

এক তলায় রান্নাঘর। একদিন অফিস বেরোব বলে প্রস্তুতি নিচ্ছি, খুব তাড়াহুড়। বৌ রান্নাঘরে ব্যস্ত। মা দোতলা থেকে নেমে এসে ঐ আলমারিটা দেখছে, আর আমার স্ত্রীকে

জিজ্ঞেস করছে, “হ্যাঁরে ওটাকি বাদাম, ওটাকি পাটালি, এটা চানাচুর? আমায় একটু দে ত।”

আমাদের বাড়ির কথা বলার ধারা এক্কেবারে সোজাসুজি। মিষ্টি করে কথা বলা আসে না আমাদের। আমি ছুঁড়ে দিলুম, “ওঃ মা, ওকে বিরক্ত করছ কেন? ওকে জিজ্ঞেস করার কি আছে? তুমি নিজে নিয়ে নিতে পারছ না? দেখলুম আমার মায়ের চোখে জল, যা সচরাচর দেখা যায় না। বললুম, “এ কী? আমিতো খারাপ কিছু বলিনি। আমি তো তোমায় নিজে নিয়ে নিতে বললুম।” মা বলল, “তুই আমায় জিজ্ঞেস না করে নিজে নিয়ে নিতে বললি বলেই ত... নিজেকে সামলাতে পারলুম না। তোর বাবা নেই, আমার যেন সে জোর আর নেই।”

বাবার ছিল তুলা রাশি, মার সিংহ। বাবা বলত, তোর মা আমায় ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। বাবা জানতেও পারলনা, কে কাকে উড়িয়ে দেয়, কারও না থাকাটা, কারও থাকাটাকে কত অসহায় করে দেয়!

সেরিব্রাল স্ট্রোকে আমি নার্সিং হোমে ভর্তি। ডাক্তার বাহাত্তর ঘণ্টা সময় দিয়েছে। আমার স্ত্রী ও ছেলে নার্সিং হোমে আসা যাওয়া করছে। ঘন ঘন আত্মীয় স্বজনেরও অফিস থেকে ফোন আসছে। সকলে চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। মা ধীর, স্থির – আমার স্ত্রী ও ছেলে যাতে ভেঙ্গে না পড়ে। যখন আমার স্ত্রী নার্সিং হোমে আমাকে দেখতে বেরোয়,

তখনই মা তাকে বলে, “বৌমা তোমার আঁচলটা আমার পায়ে ছুঁইয়ে নিয়ে যাও।”

আমার স্ত্রী একবার জিজ্ঞাসা করে বসল, “কেন মা?”

মা বলল, “আমার পায়ের ধুলো ছেলেটার মাথায় দিও। ঠাকুরকে রোজ বলি, আমার আয়ু ছেলেটাকে দাও।”

মার নাকি একদিনও ভুল হয়নি।

মা আর নেই, মায়ের আয়ু নিয়ে আমি আজও আছি। না হলে, এ কথা বলা হতনা। নিশ্চল প্রতিমা প্রতি মায়েরই মৃন্ময়ী রূপ। মাকে অবহেলা করে প্রতিমার পূজা সম্পন্ন হয় না। ■

পাণ্ডুলিপির দফতর থেকে...

- সম্প্রতি ৯ - ১০ ই সেপ্টেম্বরে পাণ্ডুলিপির জন্মদিন উপলক্ষে ফেসবুকে একটি ছোট (অনলাইন) সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। যে সমস্ত সদস্য বা সদস্যারা ঐ দিন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সবাইকে আমাদের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ ধরণের আরও অনুষ্ঠান আসছে, গ্রুপে শীঘ্রই বিস্তারিত ভাবে সে সম্পর্কে ঘোষণা করা হবে।
- অক্টোবারে আসছে গুঞ্জনের দীপাবলি সংখ্যা। ঐ সংখ্যায় লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ২০ শে সেপ্টেম্বর।
- লেখা গ্রহণ ও এডিটিং সম্পর্কে আমাদের বিচারক মণ্ডলির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। গুঞ্জনের আরও কিছু বিশেষ সংখ্যা আসছে। সে ব্যাপারেও শীঘ্রই পাণ্ডুলিপিতে বিশদ ভাবে জানানো হবে।
- ভূ ভূ ভূ ভূ ভূউত বইটি ১৫ ই সেপ্টেম্বর রিলিজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাণ্ডূলিপি গ্রুপে বা ফেসবুকে অন্যত্র এই রিলিজের খবর দেওয়া হবে।

পাণ্ডুলিপির তরফ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শারদীয়ার আন্তরিক অভিনন্দন এবং অন্তহীন শুভকামনা। চলুন একসাথে এগোই।

বিনীত

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

পাণ্ডুলিপির উদ্যোগ

শীঘ্রই আসছে পাণ্ডুলিপির পরবর্তী নিবেদন

ভূ ভূ ভূ ভূ ভূউত

পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যে ভূতের গল্পের এক বিশেষ স্থান আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূতকে মানুষের ভীতির কারণ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই কারণে আজ অনেক অভিভাবক তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভৌতিক গল্প পড়তে দিতে নারাজ। তাই আজকের অনেক শিশুই ভৌতিক গল্পের রস আস্বাদনে বঞ্চিত। তাদেরই জন্য, কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকার এবং অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে, পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে চলেছে "ভূ ভূ ভূ ভূ ভূউত"। এই বইটির প্রত্যেক লেখক বা লেখিকা শিক্ষাজগতের সাথে বিভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাই এর প্রতিটি গল্পই মৌলিক এবং এক হিসাবে শিক্ষামূলক। যে কোন শিশুর জন্যই এই বইটি আকর্ষণীয় এবং অবশ্য পঠনীয়। আমরা সমস্ত অভিভাবকদেরও "ভূ ভূ ভূ ভূ ভূউত" পড়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আগে নিজে পড়ুন, তারপর বাচ্চাদের হাতে তুলে দিন।